প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

নবম বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা ● ঢাকা ● জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা, ২০১৯

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; প্রধান নির্বাহী, নলেজ অ্যালায়েন্স

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

---

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
January-March Issue, 2019; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
Prothom Alo Bhaban, 19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81, 09613113366

সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য়

৬

রা জ নৈ তি ক অ র্থ নী তি

বাংলাদেশে বুর্জোয়া আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি বিশ্লেষণ ৯
মির্জা হাসান

বৈ ষ ম্য

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন ও বৈষম্যের চালচিত্র ৪৭
এম এম আকাশ

ই তি হা স

যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ : ১৯৭১-এ 'গঙ্গা' হাইজ্যাক হয়েছিল ৭১
হাসান ফেরদৌস

মু ক্তি যু দ্ধ

কচুরিপানা ১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক অনুষঙ্গ ৯১
বাশার খান

ব ই আ লো চ না

ইহুদিদের প্রতিশ্রুত ভূমির অন্ধবিশ্বাসে গলদ ১০৩
আসজাদুল কিবরিয়া

ব ই আ লো চ না

ফারাক নির্মাণের রাজনীতি ও বিউপনিবেশায়ন ভাবনা ১২৩
সামজীর আহমেদ

লেখক পরিচিতি ১৩১

*প্রতিচিন্তা*র ২৫তম সংখ্যা এটি। এই মাইলফলক ছুঁতে পারাটা আমাদের জন্য অনেক অনুপ্রেরণার। এবারের সংখ্যায় আমরা বেশ কিছু বিষয়বস্তুর সমাহার হাজির করার চেষ্টা করেছি। এবারের সংখ্যায় রয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি, মুক্তিযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও শিল্পের বি-উপনিবেশায়ন ভাবনা নিয়ে আলোচনা।

রাজনীতি নিয়ে আলোচনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে আমাদের এই সংখ্যায় ছাপা হওয়া রাজনীতিবিষয়ক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু থাকছে রাজনৈতিক অর্থনীতি। এখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের সম্পর্কের ভিত্তিতে রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের ধরন বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। সেই আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ। এই পুরো আলোচনাটি করতে গবেষক মির্জা হাসান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে রাষ্ট্র-বুর্জোয়া সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এই পথপরিক্রমায় তিনি তুলে এনেছেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাষ্ট্রের বর্তমান সম্পর্ক। রাষ্ট্র ব্যবসায়ীদের হস্তগত হয়ে যাচ্ছে, কথাটা বহুল আলোচিত। কিন্তু কীভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি হলো এবং বর্তমানের রাজনীতিতে এর প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা কী, তা বুঝতে এই লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। ২০১৯ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর রাজনীতি বিষয়ে এমন একটি গঠনমূলক আলোচনা সমাজের সব অংশের জন্যই গুরুত্ব বহন করবে, এমনটাই আমাদের বিশ্বাস।

বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় অর্থনৈতিক সাফল্য নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। সেই সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য। বৈষম্যের আলোচনা বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলোচনা অসম্পূর্ণ। তাই দ্বিতীয় লেখা হিসেবে অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশের একটি প্রবন্ধ ছাপা হচ্ছে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্য যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি উঠে এসেছে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের

চিত্র। সমাজের বিদ্যমান এই বৈষম্য থেকেই মানুষের বঞ্চনাবোধের জন্ম। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাফল্য নিয়ে যত বেশি আলোচনা হয়, সেই তুলনায় বৈষম্যের আলোচনা খুবই কম। আমরা আশা করি বৈষম্যবিষয়ক এমন আলোচনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবেদনশীল অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখবে।

মার্চ মাস বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি কারণে। এই মাসে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর হামলার সূচনা হয়েছিল। আবার এ মাসেই বাঙালি জাতির গৌরবের প্রতিরোধ সংগ্রামের সূচনা। মার্চ তাই বাঙালির বেদনার মাস, ঘুরে দাঁড়ানোর মাস, প্রতিরোধের মাস, মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে চলার মাস। *প্রতিচিন্তার* এই সংখ্যায় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা দুটি লেখা ছাপছি।

প্রাবন্ধিক হাসান ফেরদৌসের লেখায় ভারতীয় এয়ারলাইনস 'গঙ্গা' হাইজ্যাক হওয়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের এক ভিন্ন প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে। ভিন্ন এই অর্থে যে হাইজ্যাকের ঘটনাটি ঘটিয়েছিল কাশ্মীরের কোরেশি ভ্রাতৃদ্বয়। ভারত ও পাকিস্তানের চলমান দ্বৈরথের অংশ হিসেবে সেই বিমান ছিনতাই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু সেটা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য গুরুত্ববহ ছিল। কারণ, এই ঘটনার মাধ্যমেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে এমন এক অবস্থা বিরাজ করে, যা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের যোগাযোগ কঠিন করে তোলে। এই লেখায় সেই প্রাসঙ্গিকতার বর্ণনা পাওয়া যায়।

মুক্তিযুদ্ধের এক ভিন্ন ইতিহাসের গল্প উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধে কচুরিপানার ভূমিকা বিষয়ে একটি লেখায়। সেখানে বাশার খান দেখিয়েছেন কীভাবে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সাধারণ মানুষ কচুরিপানার আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। রয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়ক অনুষঙ্গ হিসেবে কচুরিপানার ভূমিকার বর্ণনা। মুক্তিযুদ্ধের ভিন্নমাত্রার ইতিহাস তুলে আনতে এই ধাঁচের লেখা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। এই ধরনের লেখা থেকে বাঙালির গৌরবগাথা মুক্তিযুদ্ধের বহুমুখী ইতিহাস উঠে আসার অনুপ্রেরণা আসবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বই আলোচনা অংশে এবার রয়েছে ইতিহাসবিদ শ্লোমো স্যান্ডের *দ্য ইনভেনশন অব দ্য জুইশ পিপল* বইয়ের আলোচনা। এই বইয়ে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে দিনের পর দিন এক অন্ধ বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে ইসরায়েল রাষ্ট্র তাদের বর্ণবাদী নীতি অব্যাহত রেখেছে এবং ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য দাবিকে দমন করে চলেছে। যেই প্রতিশ্রুত ভূমি বা প্রমিজড ল্যান্ডের ধর্মীয় ব্যাখ্যার ওপর দাঁড়িয়ে ইসরায়েল রাষ্ট্র দাবি করে যে ফিলিস্তিনি তাদের পিতৃভূমি, তার গলদ উঠে এসেছে এই বইয়ে। বইটি আলোচনা করেছেন আসজাদুল কিবরিয়া।

দ্বিতীয় বই আলোচনায় সৈয়দ নিজারের *ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন ও সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা* গ্রন্থটি আলোচনা করা হয়েছে। বইয়ের মূল আলোচনা হলো ফারাক নির্মাণের রাজনীতি। এর প্রতিপাদ্য হলো ঔপনিবেশিক তার উপনিবেশিত অঞ্চলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। একই সঙ্গে চায় উপনিবেশিত অঞ্চল যে তার অধস্তন, সে বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করতে। এটা করার কার্যকর পদ্ধতি হলো রুচির বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব ও অধঃমন্যতা প্রমাণ। এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয় দুই শ্রেণির মধ্যে ফারাক। উপনিবেশিত অঞ্চলে দখলদারত্ব নৈতিকভাবে জায়েজ করতে হলে এই ফারাক নির্মাণ ঔপনিবেশিকের জন্য জরুরি। সামজীর আহমেদ এই বই আলোচনায় তুলে এনেছেন ফারাক নির্মাণের রাজনীতি ও বি-উপনিবেশায়ন ভাবনা।

রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে বুর্জোয়া আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি বিশ্লেষণ

মির্জা হাসান

ভূমিকা

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বাংলাদেশে একটি অনুদার বুর্জোয়া আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার উদ্ভব কীভাবে হলো, তা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের অব্যবহিত পরে ফিরে গিয়ে বর্তমান রাজনীতি পর্যন্ত চালচিত্র বিশ্লেষণ করে খতিয়ে দেখা হয়েছে। উদ্ভবের পাশাপাশি এ রকম একটি ব্যবস্থার সংহতকরণ ও ডাইনামিকস বা গতিময়তা উঠে এসেছে আলোচনায়। মূল কথা হলো রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসায়ী বা পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সম্পর্ক। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও শাসনামলের প্রেক্ষাপটে এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি সাজানো হয়েছে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ অনুযায়ী। প্রথমেই রয়েছে ১৯৭২-১৯৭৫ সময়কালের পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র। এরপর দেখানো হয়েছে কীভাবে ১৯৭৫-১৯৮১ সাল পর্যন্ত সময়ে স্বৈরতান্ত্রিক-জনতুষ্টিবাদী সরকারের উত্থান ঘটল এবং তা সংহত হলো। পরের ভাগে রয়েছে ১৯৭২-৮১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি। এরপরে এসেছে ১৯৯১-২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়ে রাষ্ট্র-বুর্জোয়া সম্পর্ক। এই সময়কালকে বলা হয়েছে 'প্রতিযোগিতামূলক উদার গণতন্ত্র'। এই ব্যবস্থার উত্থানের কালে রাষ্ট্র-বুর্জোয়া সম্পর্ক খতিয়ে দেখা হয়েছে। এই ব্যবস্থার অধীনে তৈরি পোশাক খাতে কীভাবে বিভিন্ন ডিল হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার শেষে রয়েছে একটি ভবিষ্যৎ পথরেখা। এখানে ২০১৪ সালের পরে

● অনুবাদ : **খলিলউল্লাহ্**

উদ্ভূত প্রভুত্ববাদী দলীয় ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার অধীনে ডিলের পরিবেশে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার আলোচনা করা হয়েছে। উপসংহার ও পর্যবেক্ষণ দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করা হয়েছে।

মুখ্য ধারণাগুলোর ব্যাখ্যা

এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য বিশেষ কিছু কনসেপ্ট বা ধারণার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। নিচে পাঠকের সুবিধার্থে সেগুলো তুলে ধরা হলো।

রুলস ওয়ার্ল্ড (Rules World) : এখানে আইনকানুন, নিয়মনীতি মেনে লিখিত ও আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

ডিলস ওয়ার্ল্ড (Deals World) : এটা রুলস ওয়ার্ল্ডের বিপরীত। এখানে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় পারস্পরিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে।

অর্ডারড ডিল (Ordered Deal) : ডিল অনেক সময় হয় প্রেডিক্টেবল বা আগে থেকেই আন্দাজ করা যায়। প্রতিবার একই নিয়ম মেনে ডিল হয়।

ডিজঅর্ডারড ডিল (Disordered Deal) : এটা অর্ডারড ডিলের বিপরীত। একেকবার একেক রকম হয়। আগে থেকে আন্দাজ করা যায় না। সরকারি কর্মকর্তারা কথা দিয়ে কথা না-ও রাখতে পারেন।

ওপেন ডিল (Open Deal) : যেকোনো ব্যবসায়ী ডিল করতে পারেন। সবার জন্য উন্মুক্ত। এ ক্ষেত্রে শুধু বিশেষ কিছু ব্যক্তি বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে না।

ক্লোজ ডিল (Close Deal) : ওপেন ডিলের ঠিক বিপরীত। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা পাবে।

ওপেন অ্যাকসেস অর্ডার (Open Access Order) : রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সবার সমান সুযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সার্বিক কর্মকাণ্ডে সবারই প্রবেশাধিকার রয়েছে। এটা উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার ব্যবস্থা।

লিমিডেট অ্যাকসেস অর্ডার (Limited Access Order) : ওপেন অ্যাকসেস অর্ডারের ঠিক উল্টো। সবার সমান সুযোগ বা প্রবেশাধিকার সীমিত। এটা সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা আবার তিন ধরনের হয়—ভঙ্গুর, মৌলিক ও পরিপক্ব।

ভঙ্গুর (Fragile) : রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরে বিদ্যমান সংগঠনগুলোকে তেমন কোনো প্রতিরক্ষা দিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র নিজেই ভেতরের কিংবা বাইরের সহিংস আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে তেমন সক্ষম নয়।

মৌলিক (Basic) : মৌলিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র অনেকটা সংগঠিত এবং সাধারণত সহিংস আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ সংগঠনগুলোকে রাষ্ট্র কিছু মাত্রায় প্রতিরক্ষা দিতে পারে কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠানের

বাইরে রেখে নয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সামাজিক এলিটদের অধিকার ও সুবিধাগুলো দারুণভাবে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র।

পরিপক্ক (Mature) : সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার পরিপক্ক অবস্থায় রাষ্ট্র যথেষ্ট সংগঠিত এবং সঙ্গে রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ সংগঠনের বাইরে অর্থাৎ তার সরাসরি নিয়ন্ত্রণের বাইরেও অনেক উন্নত স্তরের ও বিশেষায়িত সামাজিক বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে পরিচালিত হতে সমর্থন দিয়ে থাকে। কিন্তু তার পরও এ ব্যবস্থায় এই সামাজিক বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনভাবে চলার বা স্বাধীন হয়ে ওঠার একটা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক দৃশ্যমান বা অপ্রত্যক্ষ সীমারেখা আছে। রাষ্ট্র তার বাইরের সংগঠনগুলোর ওপর এমনভাবে তদারকি ব্যবস্থা চালু রাখে বা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে, যাতে করে রাষ্ট্র প্রতিযোগিতা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে রাষ্ট্র রেন্ট বা বাড়তি সুবিধা (যা বাজার দ্বারা নির্ধারিত নয়) সৃষ্টি করতে পারে না। আর তা না করতে পারলে রাষ্ট্রের পক্ষে প্রভুত্ববাদী এলিট জোটের চাহিদা—যেমন এলিটদের নিজেদের মধ্যে সহিংসতা কমানো, সামাজিক ব্যবস্থা অটুট রাখা, সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি এলিটদের আনুগত্য বজায় রাখা ইত্যাদি শর্ত পূরণ করা সম্ভব হয় না।

বুর্জোয়া অনুদার ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ : ১৯৭২-২০১৮

১৯৭২-৭৫ : পেটি বুর্জোয়া 'সমাজতন্ত্র'

এই সময়কালে একটি প্রভুত্ববাদী দলীয় শাসন (ডমিন্যান্ট পার্টি) ছিল। এর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থনৈতিক জনতুষ্টিবাদ ও অনুদার শাসন, যা শেষ পর্যন্ত একদলীয় শাসনে রূপ নিয়ে বাকশাল গঠিত হয়। এই সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারি খাতনির্ভর অর্থনৈতিক কৌশল অনুসরণ করে। এটা ঘটেছিল জাতীয়করণ ও বাজার অর্থনীতির পরিধি ব্যাপকভাবে কমিয়ে ফেলার মাধ্যমে। এর বেশ কিছু কারণ ছিল। যেমন অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে ছিল স্থানীয় উদ্যোক্তার অভাব। রাজনৈতিক অর্থনীতির কারণের মধ্যে ছিল 'অন্তর্বর্তী সরকারের'[১] জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সুবিধা বণ্টন এবং রাজনৈতিক দলীয় লোকদের যথেচ্ছাচার লুটতরাজ বন্ধে সরকারের অক্ষমতা। এ ছাড়া বিদ্যমান মতাদর্শও অন্যতম একটি কারণ ছিল। যেমন আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায়ের কিছু নেতা, সরকারের চরমভাবাপন্ন তরুণ নেতৃত্ব এবং কিছু বামঘেঁষা অর্থনীতিবিদের মধ্যে 'সমাজতান্ত্রিক' অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের আগ্রহ। এই অর্থনীতিবিদেরাই প্রভাবশালী প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন (কোচানেক ১৯৯৩; মনিরুজ্জামান ১৯৮০ ও ১৯৮২; সোবহান ও আহমেদ ১৯৮০; ইসলাম ১৯৭৯; ২০১৩; করিম ২০০৫; ইসলাম ২০১৬)। এ ছাড়া

বেসরকারি ব্যবসা খাত ছিল খুবই ছোট। সামষ্টিক শক্তি হিসেবেও এই খাত রাজনৈতিকভাবে ছিল দুর্বল। তাই শিল্প জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তেমন কোনো গুরুতর বাধা ছিল না (ইসলাম ২০১৩; সামষ্টিক ফোরাম হিসেবে ব্যবসার দুর্বলতার জন্য দেখুন, কোচানেক ১৯৯৩)। বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী জনপ্রিয় অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও চর্চাও এই সরকারের 'সমাজতান্ত্রিক' অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণে অনেকটা ভূমিকা রেখেছে। এসব তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে 'নির্ভরশীলতা' তত্ত্ব, পুঁজিবাদের নব্য-মার্ক্সবাদী সমালোচনা ইত্যাদি। আর চর্চার মধ্যে ছিল ইউরোপে সামাজিক গণতন্ত্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও কিউবায় বিদ্যমান সমাজতন্ত্র। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৈশ্বিক সমাজতান্ত্রিক অক্ষের সক্রিয় সমর্থন ছিল। এর ফলে সরকারের বামঘেঁষা অংশের রাজনৈতিক বৈধতাও তৈরি হয়েছিল। নজরুল ইসলাম (২০১৬) মনে করেন: '...আওয়ামী লীগ ছিল একটি পেটি বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল। ফলে এই দলের সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য এখানে অভ্যন্তরীণ ও শ্রেণি স্বার্থ তাড়িত দাবির চেয়ে অনেক বেশি বাইরে থেকে আরোপিত' (পৃ. ৩২)। আওয়ামী লীগের প্রথম শাসনামলে যেসব রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অস্থিরতা ছিল, তার খুবই সমৃদ্ধ একটি গবেষণালব্ধ ফিরিস্তি পাওয়া যায় নজরুল ইসলামের লেখায়।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের উৎপাদন খাতের মোট স্থির সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল জাতীয়করণ করা শিল্পের অধীনে। অন্যদিকে বেসরকারি খাত সীমিত ছিল মধ্যম, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে। এই সরকারের শেষ দিকে অবশ্য অর্থনৈতিক অঙ্গনে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থা থেকে সরে আসার কিছু ইঙ্গিত ছিল। যেমন ১৯৭৪ সালে শিল্পনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়। সেই পরিবর্তনে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫ লাখ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩ কোটি টাকা করা হয়। এ ছাড়া দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এর বিপরীতে রাজনীতিতে উল্টো যাত্রা দেখা যায়। এর ফলে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থা আরও পাকাপোক্তভাবে মৌলিক স্তরে থেকে যায়। ১৯৭৫ সালের শুরুর দিকে এই সরকার বহুত্ববাদী গণতন্ত্র একদমই বাতিল করে। তখন এই সরকার প্রায় টোটালিটারিয়ান বা সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রে[২] পরিণত হয়। কিন্তু এই সরকার বেশি দিন টেকেনি। দ্রুতই ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে এক সহিংস সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই শাসনের অবসান হয়।

স্বৈরতান্ত্রিক-জনতুষ্টিবাদী সরকারের উত্থান ও সংহতকরণ : ১৯৭৫-১৯৮১

এই সময়কালের রাজনৈতিক শাসক ছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান, যিনি জেনারেল জিয়া নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন একজন জনতুষ্টিবাদী সামরিক

স্বৈরশাসক। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অধীনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কৌশলের আমূল পরিবর্তন ঘটে। তিনি রাষ্ট্রীয় খাতের নেতৃত্বাধীন 'সমাজতান্ত্রিক' নীতি ত্যাগ করে বেসরকারি খাতনির্ভর উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর এ ধরনের অর্থনৈতিক নীতি ও মতাদর্শ পরিবর্তনের সমর্থন আসে রাষ্ট্রের বেশ কিছু অংশ থেকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রক্ষণশীল রাজনীতিক, বাজারমুখী অভিজ্ঞ আমলা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থন। এরাই বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফের নীতি-নির্দেশনা অনুযায়ী বাজারমুখী অর্থনৈতিক সংস্কারসাধনের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য এমন কিছু নীতির উদাহরণ দেখা যাক। যেমন ১৯৭৫ সালে নতুন শিল্প বিনিয়োগ নীতি ঘোষণার ফলে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়, বড় আকারের উৎপাদনে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়, বেসরকারি খাতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করা হয় এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জকে পুনরায় চালু করা হয়। অর্থনৈতিক মতাদর্শ ও কৌশলে এমন গুরুতর পরিবর্তনের ফলে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থায় যে অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল, তা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে বলা যায়, এ সময়েই অর্থনৈতিক অঙ্গনে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থা থেকে আধা পরিপক্বতার দিকে রূপান্তরের বীজ বপন করা হয়। মজার ব্যাপার হলো, ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সময়ে সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়ার শুরু করা সীমিত আকারে বহুত্ববাদী রাজনীতি[৩] তাঁর আগের শাসনামলের সর্বাত্মকবাদী ধারার স্থলাভিষিক্ত হয়। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত জিয়ার শাসনামলের এই সময়ে প্রভুত্ববাদী দলীয় রাষ্ট্রের[৪] উত্থান ঘটে। এই অর্থে দেখলে রাজনৈতিক অঙ্গনেও মৌলিক সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার ক্ষয়সাধন শুরু হয় জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বেই। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের দৃষ্টিকোণ থেকে এ আলোচনা থেকে দেখা যায় যে রাজনৈতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে এই প্রবৃদ্ধির সময়কালে খুবই অস্থিরতা দেখা দেয়। প্রভুত্ববাদী দলীয় সরকার পরিণত হয় প্রায় একটি সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রে। এই সরকারের আবার উৎখাত ঘটে সহিংস সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। যার ফলাফলই হলো সামরিক স্বৈরশাসন। অন্য অর্থে বললে তা দুর্বল কর্তৃত্ববাদী শাসন, যার পরেই আবির্ভাব ঘটে স্বল্প সময়ের প্রভুত্ববাদী দলীয় সরকারের।

রাষ্ট্র-বুর্জোয়া সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি : ১৯৭২-৮১

১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত কয়েক বছর বন্ধ থাকার পরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি একেবারেই ব্যবসাবান্ধব হয়ে ওঠে। কিন্তু এর মধ্যেও ব্যবসাবান্ধব সংস্কার

বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'নমনীয় রাষ্ট্রের' কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে বেসরকারীকরণ এবং নীতি সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবসার ওপর থেকে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার ব্যাপারে এই নমনীয়তা দেখা যায়। বাংলাদেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তারা সব সামাজিক শ্রেণি ও গোষ্ঠীকে নিজেদের দখলে নিতে চেষ্টা করে, যাকে বলা হয় 'ক্যাচ-অল' ('ক্যাচ-অল' ধারণা নেওয়া হয়েছে বিশ্লেষক মেইনওয়ারিংয়ের কাছ থেকে [১৯৯৯])।

একটি সমাজে অনেকগুলো শ্রেণি ও গোষ্ঠী রয়েছে। যেমন শিল্পশ্রমিক, সরকারি খাতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী এলিট, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, সব ধরনের কৃষকশ্রেণি, শহর, গ্রাম ইত্যাদি। কিন্তু এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলো কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করার বদলে সবাইকে তুষ্ট করতে চায়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর ব্যবসায়ী শ্রেণির অভূতপূর্ব প্রভাব থাকায় একটি ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে এই দলগুলো ক্ষমতায় গেলে ব্যবসায়ী শ্রেণির সঙ্গে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে এমন গোষ্ঠী বা শ্রেণির পক্ষে কোনো নীতি বাস্তবায়নে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। দলগুলোর এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বহুলাংশে নমনীয় রাষ্ট্রের লক্ষণ বোঝা যায়। সব ধরনের সরকারের সময়েই এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে সরকারগুলোর অবস্থা দেখলে বোঝা যায় যে এলিটদের মধ্যে এ রকম দ্বিধা থাকায় শক্তিশালী বেসরকারীকরণ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রের অনীহা কাজ করে (বাংলাদেশের বেসরকারীকরণের প্রেক্ষাপটে এলিট দ্বিধার ব্যাপারে সমৃদ্ধ গবেষণালব্ধ কাজের জন্য দেখুন, মোনেম ২০১৪)। এই দ্বিধা থেকেই বিদ্যমান দুর্বল শ্রম অধিকার যেমন বোঝা যায়, তেমনি শ্রমিকবিরোধী রাজনৈতিক সমঝোতার স্থায়িত্বও আঁচ করা যায়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের 'নমনীয় একনায়কতান্ত্রিক' ধরন নির্দিষ্ট করে পোশাক খাতের প্রেক্ষাপটে বোঝার জন্য আহমেদ, গ্রিনলিফ, ও স্যাকস (২০১৪) নামক গবেষকদের কাজ দেখা যেতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশই প্রথম তার অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করেছিল। সে ক্ষেত্রে বাইরের চাপ যেমন ছিল, তেমনি অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও পরবর্তীকালে ব্যবসাবান্ধব নীতি প্রণয়ন ও গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিল। বাইরের চাপের মধ্যে ছিল বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ[৫]। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিল আওয়ামী লীগের প্রথম সরকারের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে 'সমাজতান্ত্রিক' ও বাম 'জনতুষ্টি' মতাদর্শকে প্রান্তিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া, ১৯৭৫-পরবর্তী রাজনীতিতে বাজারপন্থী এলিট যেমন রাজনীতিবিদ ও টেকনোক্র্যাট—দুইয়েরই প্রভাব (কোচানেক ১৯৯৩), একনিষ্ঠ বাম রাজনীতির অনুপস্থিতি এবং আইন করে ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে দুর্বল করে ফেলা[৬]। এই সময়ে এ রকম উচ্চপর্যায়ে এলিট রাজনৈতিক সমঝোতাই আসলে মধ্যম পর্যায়ের ডিলের ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এর মাধ্যমেই

নির্ধারিত হয়েছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক।

১৯৭৫ সালের পরে ডিলের পরিবেশে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন তৈরি হয়েছিল। তার আগে এই পরিবেশ ছিল অনেকটা ক্লোজ ও ডিজঅর্ডারড। এগুলো বোঝা যায় যদি কিছু বিষয়ে নজর দেওয়া যায়। যেমন শিল্পের জাতীয়করণ প্রক্রিয়ার সুশাসন, অনুমতিপত্র ও লাইসেন্স বণ্টন, ভূমি সংস্কার বিষয়ে অনিশ্চয়তা, সম্পত্তি অধিকারের ফয়সালা ইত্যাদি। কিন্তু সেই পরিবেশ ক্রমাগত ওপেন ও অর্ডারড হয়েছে। ১৯৭৫-পরবর্তী সরকার, বিশেষায়িত সরকারি ব্যাংক থেকে শিল্পঋণ অনুমোদনের নীতির ক্ষেত্রে একটি প্রচণ্ড নমনীয় নীতি অনুসরণ করেছে। এর কারণ ছিল নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা এবং বেসরকারি খাতনির্ভর শিল্প প্রবৃদ্ধি বাড়ানো। তবে এর ফলে ব্যাপক ঋণখেলাপি সৃষ্টি হয় (সোবহান ১৯৯১)।

এই অবাধ লুটপাট বা 'আদিম পুঞ্জীভবন' (Primitive Accumulation) কৌশল ছিল সাধারণত সীমিত আকারে ক্রোনিজম বা স্বজনতোষীবাদ-ভিত্তিক, কিন্তু মূলত এর ভিত্তি ছিল ওপেন ডিল। এটা সীমিত আকারে ছিল, যাদের রাজনৈতিক যোগাযোগ ভালো ছিল ও যারা দলীয় ব্যবসায়ী তাদের জন্য। আর উন্মুক্ত ছিল বড় ব্যবসায়ী অংশ, যাদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণিটিই বাজারনির্ভর দুর্নীতির সক্রিয় রূপ সূচনা করেছে। কারণ, এসব উদ্যোক্তা অযাচিতভাবে সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দিত। তারাই ব্যাপক দুর্নীতির ব্যবস্থা চালু করে। আর এটা করে মূলত ব্যাংকের কর্মকর্তারা (ইসলাম ও সিদ্দিক ২০১০)।

তবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মকর্তারাও যুক্ত ছিলেন। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতো অর্ডারড ডিলের মাধ্যমে (ডিলের নিশ্চয়তা ছিল)। জিয়া সরকারের উদার ব্যাংকঋণ বিতরণও ছিল পৃষ্ঠপোষকতার নীতি। উদ্দেশ্য ছিল অনুগত রাজনৈতিক সমর্থকগোষ্ঠী তৈরি করা এবং তাঁর নতুন রাজনৈতিক দলকে সংহত করা।[৭] প্রথমে তাঁর দলের নাম ছিল জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল, যা পরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি হয়ে ওঠে। এটাকে সম্ভবত রাজনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল 'রাজনৈতিক বাড়তি সুবিধা বা রেন্ট' সৃষ্টি ও বণ্টনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যেতে পারে। এ ধরনের বাড়তি সুবিধা ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিকভাবেও লাভজনক ছিল। এর নজির দেখা যায় তৈরি পোশাক খাতের উদ্ভব এবং দেশীয় উদ্যোক্তা শ্রেণি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে (রশিদ ২০০৮)। আগেই বলা হয়েছে যে এ দেশীয় উদ্যোক্তা তৈরির ব্যাপারটি স্বাধীনতার প্রথম দশকে ছিল খুবই কম। এই উদ্যোক্তাদের খুবই কমসংখ্যক আবার সৃষ্টি করা হয়েছিল সরকারি মালিকানাধীন শিল্প-কারখানা বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে। এই সময়ে ও তার পরেও বিলগ্নীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার কাজ বহুলাংশেই ব্যর্থ হয়েছিল। এ জন্য বেশ কিছু জটিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ জড়িত ছিল

(এবং কাজগুলো করা হতো গোপন ডিলের মাধ্যমে)। এই কারণগুলো একে একে বলা যাক।

সরকারি খাতে যে শিল্প (মূলত পাট ও তুলার) ষাটের দশকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যা আবার সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশকে বিলগ্নীকৃত হয়েছে, সেগুলো বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগিতাসক্ষম ছিল না। সরকারি মালিকানাধীন থাকার সময়ে এসব শিল্পের সম্পদ মূলত সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতারা একরকম লুট করেছে। সরকারি ভর্তুকি যা পাওয়া যাবে বলে বেসরকারি মালিকেরা আশা করেছিলেন, তা রাজনৈতিক কারণে কখনোই আসেনি। অনেক ক্রেতারই দক্ষভাবে এসব শিল্প পরিচালনার কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তারা এসব শিল্প কিনে নিয়েছিল শুধু যন্ত্রপাতি বিক্রি করার আশায় এবং ভবিষ্যতে শিল্প-কারখানা স্থাপন বা বেশি দামে বিক্রির জন্য আকর্ষণীয় জমি পাওয়ার ভরসায়। এই প্রক্রিয়ায় আবার স্বজনতোষণ ছিল। তাই এমন সব লোকের হাতে এগুলো গিয়ে পড়েছিল, যাদের উদ্যোক্তা হওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষাই ছিল না। রাজনৈতিক দলীয় সুবিধাভোগীরা আবার বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়াকে তাদের কালোটাকা সাদা করার একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছিল (খান ২০১৩; সোবহান ২০০৫; মোনেম ২০১৪)।

এখন পেছনে ফিরে দেখলে যে কেউ বলতে পারে যে সরকারি খাতের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া ঘিরে যেসব বুদ্ধিবৃত্তিক বাদানুবাদ ও ঝাঁজালো বিতর্ক ছিল, তা অবশেষে কথার ফুলঝুরিতে পর্যবসিত হয়। কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য বেসরকারীকরণের অর্থনৈতিক ফলাফল ছিল বেশ কম; অন্তত নতুন উদ্যোক্তা ও পরবর্তীকালে সক্ষম শিল্পায়ন সৃষ্টি না হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা হয়। এসব বাদানুবাদ ও বিতর্ক ছিল মূলত স্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও দাতাগোষ্ঠীর মধ্যে, যা থেমে থেমে আশি ও নব্বইয়ের দশকেও গড়িয়েছিল।

আবার যে কেউ এ-ও বলতে পারে যে জিয়া সরকারের ঋণ বিতরণ ও পৃষ্ঠপোষকতার নীতির কারণে যে পরিপূর্ণ ক্রোনি বা স্বজনতোষী পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছিল, তা বলাটা আসলে পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ ডিলের ধরনগুলো বেশির ভাগই ক্লোজ হওয়ার পরিবর্তে ওপেন ছিল। ফলে সেগুলো থেকে বোঝা যায় না যে এর ফলে স্বজনতোষী পুঁজিবাদ তৈরি হয়েছিল। তবে এ ধরনের স্বজনতোষী পুঁজিবাদ শেষ পর্যন্ত জেনারেল এরশাদের ক্লেপটোক্র্যাটিক শাসনামলে (১৯৮২-১৯৯০) তৈরি হয়েছিল (ক্লেপটোক্র্যাসি এমন এক সরকার, যেখানে দুর্নীতিপরায়ণ নেতারা তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে জনগণের সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ দুটিই কুক্ষিগত করার মাধ্যমে নিজেদের ধনসম্পদ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করে—অনুবাদক)। তবে এরশাদের সময়ে যে স্বজনতোষী পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছিল, তা উৎপাদন খাতের বদলে বাণিজ্য ও সেবা খাতকেই বেশি আক্রান্ত করেছিল। এর

ফলেই সম্ভবত পরবর্তী দশকগুলোয় শিল্পোন্নয়নের তুলনামূলক শক্তিশালী ধরন তৈরি হয়েছিল।

জেনারেল এরশাদের সামরিক স্বৈরতন্ত্র এবং রাষ্ট্র-বুর্জোয়া সম্পর্কের ধরন

জেনারেল এরশাদের শাসনামলের রাজনৈতিক অর্থনীতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্য তাঁর সময়কে দুটি বড় ধাপে ভাগ করতে হবে। একটি হলো সামরিক স্বৈরতন্ত্র, যা ছিল নড়বড়ে একনায়কতন্ত্র (১৯৮২-৮৬)। আরেকটি হলো প্রভুত্ববাদী দলীয় শাসন (১৯৮৬-১৯৯০)। বিএনপি সরকারের শেষ দিকে প্রভুত্ববাদী দলীয় শাসনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত আকারে বহুত্ববাদের মতো যেটুকুই গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটেছিল, এরশাদের প্রথম পর্বে তার সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তা দ্বিতীয় রাজনৈতিক পর্বে এসে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এর মানে হলো একই রকম রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি সেই সময়ের প্রবৃদ্ধির পর্বে (১৯৮৩-১৯৯০) সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থায় বা লিমিটেড অ্যাকসেস অর্ডারে দেখা গিয়েছিল। রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির মধ্যে ছিল সীমিত আকারে নাগরিক অধিকার পশ্চাৎ-মুখী হওয়া এবং পুনরায় এর অগ্রগতি ঘটা। এই পুরো সময়ে জেনারেল এরশাদ ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান। ১৯৮১ সালে জিয়া হত্যাকাণ্ডের পরেই এরশাদ রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন ১৯৮২ সালে। ১৯৯০ সালে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে। এরশাদের শাসনামলের একদম শেষ দিকে এসে অবশ্য সামরিক বাহিনীও তাঁকে আর সমর্থন দিতে চায়নি (এই সময়ের গবেষণালব্ধ সমৃদ্ধ আলোচনার জন্য দেখুন, আলি ২০১০)।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আগের সরকারের বাজারমুখী অর্থনৈতিক সংস্কারকে এরশাদ আরও গভীরে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো বড় সরকারি ব্যবসা ও ব্যাংকগুলোর বেসরকারীকরণ। এর ফলে শিল্পশ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ও সরকারি খাতের কর্মীদের মধ্যে গুরুতর প্রতিরোধ দানা বাঁধে (আরও জানতে দেখুন মোনেম ২০১৪)। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর আন্দোলন দমনের জন্য এরশাদ সরকার বিভিন্ন আইন তৈরি করে। এর ফলে জিয়ার শাসনামলের শেষের দিকে যেটুকুই শ্রমিক অধিকার ছিল, তা-ও হারিয়ে যায় (ফারুক ২০০৯)। তবে ইউনিয়নগুলোর আন্দোলন দমনের জন্য শুধু সভা-সমিতির অধিকার নিষিদ্ধ করা ও আইনবহির্ভূত বলপ্রয়োগেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এরশাদ সরকার তার পৃষ্ঠপোষক নেটওয়ার্কের লোকদের মাধ্যমে শক্তিশালী ইউনিয়ন নেতা ও প্রভাবশালী বাম নেতাদের নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসে। এই লোকদের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ছিল গভীর সম্পর্ক। তাদের অনেকগুলো কৌশলের মাধ্যমে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসে এরশাদ। এর মধ্যে অন্যতম ছিল তাদের মন্ত্রিপরিষদে জায়গা করে দেওয়া।

এই সময়ের অর্থনৈতিক শাসনপ্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো স্বজনতোষী পুঁজিবাদের পরিপূর্ণ বিকাশ, যেখানে পৃষ্ঠপোষকতা বণ্টন প্রক্রিয়ায় এরশাদের ব্যক্তি-আদর্শিক, ক্লেপটোক্র্যাটিক ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বহাল ছিল। এই প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে কোচানেকের লেখায় (কোচানেক ২০০৩; পৃ. ৬৮-৬৯) :

'১৯৮২ সালে জিয়া হত্যাকাণ্ড ও এরশাদের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতার সংস্কৃতি এক অন্য উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছেছিল। এরশাদ তাঁর সরকারের বৈধতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখার কৌশল হিসেবে রাষ্ট্রক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতাকে বেছে নেন। এরশাদই ব্যক্তিগত লাভের সংস্কৃতি চালু করেছিলেন, কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করেছিল পৃষ্ঠপোষকতা। এরশাদের অধীনে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহৃত হতো ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে, যিনি নিজেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এরশাদ তাঁর নিজের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। তিনি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে বিপুলসংখ্যক ফাইল দেখে দিতেন। একজন পর্যবেক্ষকের মতে, এরশাদের প্রেসিডেন্সিয়াল সচিবালয় ছিল "অনেকটা দালালি ঘরের মতো। এখান থেকেই কন্ট্রাক্ট, আমদানির লাইসেন্স বা ব্যাংক লোনের অবস্থা জানতে ফোন করা হতো"। একজন পরম্পরাভিত্তিক বংশগত নেতার মতোই এরশাদ নিজের পক্ষে সমর্থন জোগাতে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সুবিধা দিতেন। এমনকি উন্নয়ন প্রকল্পগুলোও এর বাইরে ছিল না। কোনো প্রকল্প পাস হবে কি হবে না, তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো কন্ট্রাক্ট ও কমিশনের সংখ্যা ও আকারের ভিত্তিতে, যদি তা প্রকল্প পক্ষপাত, স্বজনপ্রীতি, ব্যক্তিগত লাভ ও মুনাফা আদায়ের শর্তগুলো পূরণ করত তাহলে। এখানে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, সমতাভিত্তিক নীতি বা জনস্বার্থ দেখা হতো না। রাজনৈতিক এলিট ও সিভিল সমাজের মধ্যে জটিল কতগুলো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো বিনিময় স্বার্থ বিরাজমান ছিল। এই বিনিময় স্বার্থে জনদায়িত্ব গুরুত্ব পেত না। এর ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ, প্রেরণা ও বাধ্যবাধকতা।'

এরশাদের আমলে একটি অন্যতম আশ্চর্যজনক ও চিন্তা উদ্রেককারী উন্নয়ন ঘটেছিল দেশীয় ওষুধ কোম্পানিগুলোর বিস্তার ও অর্থনৈতিক সংহত অবস্থার ক্ষেত্রে। এটা সম্ভব হয়েছিল একটি প্রগতিশীল ও কার্যত 'জাতীয়তাবাদী' ওষুধনীতির ব্যাপারে এরশাদের অনুমোদন ও সমর্থনের কারণে। কারণ এর ফলে তত দিন পর্যন্ত ওষুধ উৎপাদনে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর যে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল, তা কার্যকরভাবে রদ হয়েছিল। আর এরশাদের এই নীতির প্রতি স্থানীয় ও বৈশ্বিক বাম ও বাম-উদার বুদ্ধিজীবী ও স্বাস্থ্য আন্দোলনকর্মীদের সমর্থন ছিল। এমনকি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারও সমর্থন ছিল। এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কার্যত একটি ক্লোজ ডিলের কারণে খাত হিসেবে দেশীয় ওষুধশিল্প লাভবান হয়। ফলে এই

শিল্পের বৃদ্ধি ঘটে ও আধুনিকায়ন হয় (কোচানেক ১৯৯৩)। এরশাদ কেন এটা করেছিলেন? কারণ এরশাদ বেপরোয়াভাবে জনপ্রিয় হতে চাইছিলেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এরশাদের চেয়ে কম জনপ্রিয় আর কোনো সরকার ছিল না। এই নীতির ফলে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সিভিল সমাজগোষ্ঠী থেকে সমর্থন পেতে থাকেন। এমনকি বাম ঘরানার দেশীয় বুদ্ধিজীবী ও বহুজাতিক অ্যাক্টররাও তাঁকে সমর্থন করেন। ওষুধ খাতের 'জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের' সমর্থন লাভ ছিল এরশাদের জন্য খুবই অপ্রত্যাশিত বিষয়।

এরশাদের আমলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ক্লোজ কিন্তু অর্ডারড ডিল দেখা যায়। যেমন আমদানি-রপ্তানি ও বড় নির্মাণ প্রকল্পের জন্য লাইসেন্স ও অনুমোদন দেওয়া, যা শুধু শিল্পকারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না।[৮] অর্থনীতি আধুনিকায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল ব্যক্তি খাতে প্রথম টেলিকম ব্যবসার (মুঠোফোন) প্রতিষ্ঠা। এটা হয়েছিল ক্লোজ ডিলের মাধ্যমে। টেলিকমের মালিক ছিলেন এরশাদের মন্ত্রিপরিষদের একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য। তিনি এরশাদের আমলে একচ্ছত্র ব্যবসা করে গেছেন। শিল্প খাতের জন্য ঋণ অনুমোদন এবং জাতীয়করণ করা শিল্পের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় তার আগের বিএনপির আমলের মতোই এরশাদের আমলেও স্বজনতোষণ ও ওপেন-অর্ডারড ডিলের মিশ্রণে হয়েছে, যদিও স্বজনতোষণ ছিল বড় পরিসরে। রাষ্ট্র-ব্যবসার এ রকম সম্পর্কের কারণে স্থানীয় উদ্যোক্তার একটি বড় অংশ তৈরি হয়েছিল, বিশেষ করে তৈরি পোশাক কারখানা মালিকের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছিল[৯] এবং বেসরকারি খাতে পুঁজি সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলেই সম্ভবত অনেকাংশে প্রবৃদ্ধি দ্রুত বেড়েছিল। তবে তা ছিল খুবই দুর্বল প্রকৃতির।

'প্রতিযোগিতামূলক উদার গণতন্ত্রের' উত্থান (১৯৯১-২০১৩)[১০] এবং রাষ্ট্র-বুর্জোয়া সম্পর্ক

এই দীর্ঘ রাজনৈতিক পর্বে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থায় কিছু অভ্যন্তরীণ অগ্রগতি হয়েছিল। আগের মৌলিক ধাপ থেকে এই ধাপে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থা আধা পরিপক্কতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এই সময়েই প্রতিযোগিতামূলক মক্কেল তোষণবাদ বা কম্পিটিটিভ ক্লায়েন্টিলিজমের উত্থান ঘটে (খান ২০১৩)। কারণ প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই এই প্রথা প্রোথিত ছিল।[১১] সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থাকে আমরা আধা পরিপক্ক[১২] বলছি কারণ এই সময়ে রাজনৈতিক উন্নয়ন তেমন ঘটেনি। ফুকুয়ামার (২০১১) ধারণা অনুসরণ করে বলা যায়, রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে রাষ্ট্র নির্মাণ[১৩], আইনের শাসন সংহতকরণ এবং গণতন্ত্রায়ণের মধ্যে একটি স্থিতিশীল ভারসাম্য থাকবে। এই সময়েই এমন এক রাজনৈতিক-প্রাতিষ্ঠানিক

ধরনের উত্থান ও সংহতকরণ ঘটেছে, যাকে বলা হয় পার্টিয়ার্কি বা দলীয় তন্ত্র।

দলীয় তন্ত্র এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যদিও গণতান্ত্রিক, কিন্তু 'রাজনৈতিক দলগুলো আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে কুক্ষিগত করে ফেলে এবং সমাজকে দলীয় বিভাজনের ভিত্তিতে ভাগ করে ফেলে' (কোপেজ ১৯৯৪, পৃ. ১৮)। এই রাজনৈতিক পর্বে দলীয় তন্ত্র[১৪] দুটি আলাদা রূপ ধারণ করে। একটি হলো একাধিপত্যভিত্তিক আর অন্যটি দ্বৈত আধিপত্যভিত্তিক। একাধিপত্যের প্রভাব ছিল রাজনীতিতে আর দ্বৈত আধিপত্যের প্রভাব ছিল অর্থনীতির ক্ষেত্রে। এর মানে হলো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল 'রাজনৈতিক বাড়তি সুবিধার' ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য রাখতে চায়, যা ক্ষমতা প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার মতোই। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাড়তি সুবিধা বা লাভের অংশ বিরোধী শক্তির সঙ্গেও ভাগাভাগি করে নেয়। এটা নির্ভর করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোর ধরনের ওপর।

রাজনৈতিক অঙ্গনে এই একাধিপত্যধর্মী দলীয় তন্ত্রের প্রভাবে নির্বাচনী গণতন্ত্র সংহত হয় না এবং রাজনৈতিক অস্থিরতাও ঘন ঘন ঘটে। এটা মূলত সরকারের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এর ফলে সরকারের ধারাবাহিকতার প্রেক্ষাপটে বললে, একটি নিজগুণে বলীয়ান ও শক্তিশালী এলিট রাজনৈতিক সমঝোতার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোর বহু চেষ্টায়ও এ ধরনের সমঝোতায় পৌঁছানো তখন সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক এলিটরা অন্তর্বর্তী একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদ্ধতি বের করে নির্বাচন দেখভাল করার একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এ ব্যবস্থাও ব্যর্থ প্রমাণিত হয় যখন আসন্ন ক্ষমতাসীনেরা পুরো ব্যবস্থাকে তাদের পক্ষে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালায়।[১৬]

আমাদের বর্তমান বিশ্লেষণের জন্য রাষ্ট্র-বুর্জোয়া সম্পর্কের ওপর দ্বৈত আধিপত্যনির্ভর দলীয় তন্ত্রের প্রভাব ক্ষতিয়ে দেখা বেশি প্রাসঙ্গিক। বাড়তি সুবিধা উৎপন্ন করা ও তার বণ্টনের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রভাব ক্ষতিয়ে দেখা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর ফলে ডিলের পরিবেশ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করার আগে আমরা বৃহত্তর রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে ব্যবসার 'রাজনৈতিক' ভূমিকা বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। এটা প্রয়োজন। কারণ, এই প্রতিযোগিতামূলক মক্কেল-তোষণবাদী পর্বেই ব্যবসার রাজনৈতিক ভূমিকার উত্থান ঘটেছে। ব্যবসার ভূমিকা এবং ব্যবসার রাজনৈতিক সক্ষমতার ব্যষ্টিক প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণের ফলে আমরা বুঝতে পারব ডিলের পরিবেশ তারা কীভাবে তৈরি করে এবং এর মধ্যেই তা কীভাবে পরিচালনা করে।

এই রাজনৈতিক পর্বের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই সময়ে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসনপ্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীদের প্রভাব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি

পেয়েছে (কোচানেক ১৯৯৩, ২০০০; হাসান, ২০০১; সিজিএস আরইডি, ২০০৬; মজুমদার, ২০১২; জাহান ও অ্যামুন্ডসেন ২০১২; রশিদ, ২০০৮; তসলিম, ২০০৮; হাসান ও প্রিচার্ড, ২০১৩ ও ২০১৬)। এসব প্রভাব দেখা গেছে আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নির্বাচনী রাজনীতি (অর্থের রাজনীতি) এবং সাধারণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়। আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রভাবের ক্ষেত্রে যেমন বলা যায় সংসদ ও রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর ব্যবসায়ীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বৃদ্ধি এবং সম্পদের মাধ্যমে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।

এসব প্রভাব যেমন জাতীয় পর্যায়ে ছিল, তেমনি ছিল আরও নিচের স্তর যেমন স্থানীয় রাজনীতিতে। ব্যবসায়ীদের এ ধরনের আধিপত্যের কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও নীতিপ্রক্রিয়ায় ব্যবসার অসম প্রভাব তৈরি হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি, সরকারি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এবং অন্যান্য নীতি প্রতিষ্ঠানগুলোয় ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি থাকায় তারা নিজেদের স্বার্থে নীতি তৈরি করতে পেরেছে। অনেক সময়ে এসব ব্যবসায়ী তাদের স্থলে নিজেদের আস্থাভাজন লোক দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে। অনানুষ্ঠানিক প্রভাবও ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বাজার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্রমান্বয়ে নীতি প্রণয়নে জায়গা পাওয়া। এগুলোর ফলাফল দেখা গেছে কর, নীতি ও ঋণ পুনর্নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে। এর ফলে বিশেষভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত খাতগুলো হলো পোশাক, আবাসন, ব্যাংক ও পরিবহন। এটা সত্য যে রাষ্ট্রক্ষমতা আইনত ও কার্যত দুই ভাবেই প্রধানমন্ত্রীর হাতে একচ্ছত্রভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। দেশের রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার চরিত্রেও ছিল ব্যক্তিশাসনের সংস্কৃতির নিদর্শন (সিজিএস ও ব্র্যাক আরইডি ২০০৬; বিআইজিডি ২০১৪; ব্লেয়ার ২০১০)।

কিন্তু তারপরও এলিট ব্যবসায়ী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলো প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রীর নীতি সিদ্ধান্ত নাকচ করতে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের তিনটি উদাহরণ টানা যায়। যেমন মূসক বা ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসা, যদিও তা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফের দিক থেকে প্রচুর চাপ ছিল। অপরটি হলো প্রয়োজন না থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে আপত্তি থাকার পরও আরও বেশি বেসরকারি ব্যাংকের অনুমোদন দেওয়া। আর তৃতীয় উদাহরণ হলো ঢাকা শহরের নগর-পরিকল্পনার ব্যাপারে আপস করা। এই আপস করা হয় শক্তিশালী আবাসন ব্যবসায়ীদের কারণে। যদিও এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল ঢাকা শহরের বাসযোগ্যতা বাড়াতে পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য।

এই রাজনৈতিক কালপর্বে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোর অধিকতর ক্ষমতায়নের প্রমাণ পাওয়া যায় কার্যত প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতির সার্বিক নিয়মনীতি (রুলস অব দ্য গেম) ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আইন প্রয়োগের ধরন বদলে দেওয়ার ক্ষমতা থেকে, যদিও তা ছিল কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে দুটি উদাহরণ দেওয়া যায়।

প্রথমত, আগেই বলা হয়েছে যে এই পর্বে সরকার ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে এলিট সমঝোতা ব্যর্থ হয়েছিল। এর ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়, বিশেষ করে হরতাল ও অবরোধ বেড়ে যায়। এ ঘটনা প্রতিটি নির্বাচনের পরেই ঘটেছে এবং স্বল্প মেয়াদে বৃহৎ ও মাঝারি ব্যবসা সময়মতো মালামাল পরিবহন করতে না পেরে দুর্ভোগে পড়েছে। এর ফলে ব্যবসার লেনদেন ও বিনিয়োগে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অনেক দর-কষাকষির পর উৎপাদক কারখানার মালিকেরা ২০০০ সালের পর থেকে হরতালের প্রভাব থেকে একধরনের মুক্তি পেয়েছে। কারণ, এই সময়ে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীরা হরতালের সময় কল-কারখানাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে বলে তেমন একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১৭]

দ্বিতীয়ত, ব্যবসার চাহিদার প্রতি সাড়া দিয়ে রাজনৈতিক এলিটরা ২০০০ সালের শুরুর দিকে চাঁদাবাজিতে জড়িত শক্তিশালী অপরাধী গোষ্ঠীগুলো দমনে কিছু উদ্যোগ নেয়। এই চাঁদাবাজি খুবই নৈরাজ্যিক ছিল এবং আগে থেকে আন্দাজ করা যেত না। নব্বইয়ের দশকের বেশির ভাগ সময়েই এরা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা করে ছাড়ে। এসব গোষ্ঠীর রাজনৈতিক যোগসূত্র থাকলেও তা বিশেষ আইন ও শৃঙ্খলার আওতায় দমন করা হয়েছে।[১৮] র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব নামে একটি বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তোলা হয়। উদ্দেশ্য ছিল চাঁদাবাজিসহ অন্যান্য অপরাধ দমন। এর ফলে ধীরে ধীরে চাঁদাবাজিটা অনেক বেশি নিয়মমাফিক ও আন্দাজযোগ্য হয়ে এসেছে। কারণ, স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতা ছাড়া তেমন একটা চাঁদাবাজি হয়নি। এদের বলা হয় 'স্টেশনারি ব্যান্ডিটস'। তবে এসব স্থানীয় নেতা অন্যান্য বহুস্থানিক দুর্বৃত্ত বা 'রোভিং ব্যান্ডিটস'দের হেনস্তা থেকে ব্যবসায়ীদের সুরক্ষা দিতেও সক্ষম হয়েছে। এসব রোভিং ব্যান্ডিটস হলো মূলত বাইরের, যাদের দলীয় কোনো পরিচয় নেই, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত। এর ফলে রাষ্ট্র বা দল সামান্য পরিমাণে 'আইনের শাসন' নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এ ক্ষেত্রে বেশি উপযুক্ত শব্দ হবে 'আইন দ্বারা শাসন'[২০]। এ দুটি ঘটনা থেকে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার মধ্যেই ইতিবাচক উপাদান দেখা যায়। কারণ, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে এই রাজনৈতিক পর্বে অন্তত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আধা পরিপক্বতা বা সেমি-ম্যাচুরিটি সংহত হয়েছে।

অবশ্য এমনও বলা যাবে না যে ব্যবসায়ী এলিটরা কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি। মোটামুটি মুক্ত ও আক্রমণাত্মক গণমাধ্যম ও নাগরিক প্রতিবাদের কারণে ব্যবসার নির্দিষ্ট পরিমাণে জবাবদিহি নিশ্চিত হয়েছিল। এই রাজনৈতিক পর্বে যে ধরনের গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করেছিল, তাতে সামাজিক গোষ্ঠীগুলো ব্যবসায়ীদের ওপর কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পেরেছিল। এই সামাজিক

গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রয়েছে সিভিল সমাজ, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পরিবেশ, মানবাধিকার ও শ্রমিকবান্ধব গোষ্ঠী। এ ছাড়া রয়েছে গণমাধ্যম। গণমাধ্যম মূলত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মাধ্যমে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আর্থিক কেলেঙ্কারি ও অবৈধ কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছে। এর মধ্যে রয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান লুট, আবাসন ব্যবসায়ী দ্বারা ভূমি দখল, শ্রমিকদের বেতন না দেওয়া এবং তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের নিরাপত্তার শোচনীয় অবস্থা। এগুলোই মূলত গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের কারণে উন্মোচন হয়েছে এই সময়ব্যাপী।[২১]

আগেই বলা হয়েছে যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দলীয় তন্ত্র দ্বৈত আধিপত্য বজায় রেখেছিল, বিশেষ করে অর্থনৈতিক রেন্ট বা সুবিধা সৃষ্টি ও তা বণ্টনের ক্ষেত্রে যদি দেখা হয়। এই পর্যবেক্ষণের আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দরকার।[২২]

যদিও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বৈত আধিপত্যের দলীয় তন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু নির্দিষ্ট পর্যায়ের একাধিপত্যও এ ক্ষেত্রে রয়েছে। যেমন ক্ষমতাসীন দল অর্থনৈতিক নীতি ও সুবিধা/সম্পদ বণ্টনে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সিদ্ধান্ত প্রণয়নের পদগুলোকে রাজনৈতিকীকরণ করে ফেলে, যেমন জাতীয়করণ করা ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ক্রয় সংস্থা নীতি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। তবে এর মধ্যেও যেসব অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর 'ভিন্ন' রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে, তারাও এসব প্রতিষ্ঠানের সুবিধা পায় এবং সুবিধা ও পৃষ্ঠপোষকতার ভাগ পায়। তবে তা অসম।

রাজনৈতিক ভিন্নতা অনুসারে সুবিধার ভাগাভাগির নির্দিষ্ট ধরন ভিন্ন হয়। এ রকম ভিন্নতার একটি অন্যতম নির্ধারক হলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি জাতীয় উন্নয়নের[২৩] জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোয় সুবিধা ও পৃষ্ঠপোষকতা বণ্টনের ওপর ক্ষমতাসীন দল একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। যেমন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের সরকারি ক্রয়, বাণিজ্য বা আমদানি লাইসেন্স প্রদান, ক্ষুদ্র বা মাঝারি মানের নির্মাণকাজ, জলাশয়গুলোর লিজ দেওয়া, সরকারি জমি বা ফেরিঘাট। এ রকম একাধিপত্য থাকলেও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক এলিটরা এসব সুবিধা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক এলিট ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয় এবং তা রাজনৈতিক পরিচয়-নির্বিশেষে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের বাইরের গোষ্ঠীরা সুবিধা নিতে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনানুষ্ঠানিক কমিশন দেয়। অপর দিকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র, যেমন বড় আকারের অবকাঠামো নির্মাণ বা বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো বিষয়ে দক্ষতা বিবেচনায় নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সংকীর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনাভিত্তিক পৃষ্ঠপোষকতা বণ্টনের চেয়ে একটা পর্যায়ের দক্ষতা যাচাই করা হয়।

ব্যাংক, টেলিকম বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন লিজিং কোম্পানি, বাণিজ্যিক ব্যাংক ইত্যাদির জন্য দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিপত্র ও লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র

দলীয় তান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কম। এর অন্যতম কারণ হলো এসব খাতের বাজার অ্যাক্টররা দলীয় নিয়ন্ত্রণ এড়াতে রাজনৈতিকভাবে কৌশলী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিরোধীদলীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরা সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের ব্যক্তিদের শেয়ারহোল্ডার এবং মুখপাত্র (ফ্রন্ট পারসন) হিসেবে যুক্ত করে থাকে। তাতে চুক্তি বা লাইসেন্স পাওয়া সহজ হয়ে যায়। বেসরকারি ফার্ম ও ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রেও আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মতো বড় দল থেকে শেয়ারহোল্ডার বা পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয় একই কারণে।

অন্যান্য বড় অর্থনৈতিক খাত যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অবকাঠামোর ক্ষেত্রে সুবিধা সৃষ্টি ও ভাগাভাগির গতিশীলতা আরও বেশি জটিল। দখল নেওয়া ও সফল সুবিধা বণ্টন দুটিই এসব খাতে প্রতিফলিত হয়।

প্রতিযোগিতামূলক মক্কেল-তোষণবাদী পর্বে ডিলের পরিবেশের এক জটিল বিবর্তন দেখা যায়। এর কারণ সম্ভবত অর্থনীতিতে তুলনামূলক নতুন ধরনের সুবিধার ব্যবস্থাপনা। এটা হলো একাধিপত্যের এক জটিল মিশ্রণ কিন্তু মুখ্যত দ্বৈত আধিপত্যের সুবিধা বণ্টন, যা ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বৈত আধিপত্যের সুবিধা ভাগাভাগি হয় রাজনৈতিক ভেদাভেদ-নির্বিশেষে। কার্যত এমন সুবিধা ব্যবস্থাপনার চর্চা হলে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা সুবিধা যেমন অনুমোদন, লাইসেন্স, লিজ ইত্যাদি পাওয়ার পদ্ধতি হয় মূলত ক্লোজ ও অর্ডারড ধরনের। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির রাজনৈতিক পরিচয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ব্যবসার এমন ক্লোজ ক্ষেত্রে ও ভিন্ন রাজনৈতিক পরিচয়ের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরা বা যাদের কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নেই, তারাও রাষ্ট্রীয় সুবিধার ভাগ পায়। ফার্মগুলোর এমন কৌশলী পদ্ধতির কারণে ক্লোজ ডিল কার্যত বহুলাংশেই ওপেন ডিলে পরিণত হয়। ব্যবসা ফার্মগুলোর মধ্যে সিন্ডিকেট করাও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের একটি জনপ্রিয় কৌশল, বিশেষ করে জেলা ও ছোট শহরের ক্ষেত্রে। সিন্ডিকেট হয় মূলত ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের লোকদের সঙ্গে দল নিরপেক্ষ ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসায়িক জোট করার মাধ্যমে। উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রীয় সুবিধা যেমন সরকারি ভবন বা রাস্তা নির্মাণ, যার ফলে মূলত রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ[২৪] ক্লোজ ডিলের জায়গাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ওপেন করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, যেমন বড় বিদ্যুৎ প্রকল্প বা অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ওপেন ডিল ছিল। এগুলো সাধারণত কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন কোম্পানিকেই দেওয়া হতো, হোক সেটা দেশি বা বিদেশি; যদিও উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে, এমন ব্যক্তিদের দর-কষাকষির জন্য বরাদ্দ করা হতো। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ক্লোজ ও ওপেন ডিলের গোলকধাঁধার মধ্যেই কাজ চালিয়ে নিতে পারছিল। এ ক্ষেত্রে তারা সহজলভ্য ও সহজে চিহ্নিত

করা যায়, এমন প্রভাবশালী এজেন্টদের সহায়তা নিত। এই এজেন্টরা মূলত নির্দিষ্ট কিছু সুপরিচিত রাজনৈতিক নেতা, যারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ঘনিষ্ঠ।

এই রাজনৈতিক পর্বে ব্যবসার পরিবেশও ছিল কার্যত অর্ডারড ডিলের, সেটা হোক ক্লোজ অথবা ওপেন। এ ক্ষেত্রে একটি বড় ব্যতিক্রম হলো কোরীয় রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা ইপিজেডের উন্নয়ন। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারের সময়ে দশকের পর দশক ধরে চুক্তি করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এলিটদের খামখেয়ালি আচরণ ছিল। এ কারণে একজন বড়সড় কোরীয় বিনিয়োগকারীর জন্য অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, যা থেকে বৈশ্বিক অন্যান্য বিনিয়োগকারীর জন্যও ভুল বার্তা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা খুবই বিরল। প্রতিযোগিতামূলক মক্কেল-তোষণবাদী পর্বে সুবিধা বণ্টনও অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে, বিশেষ করে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর ব্যাপারে। মূলত তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কেন্দ্রীভূত ছিল। কেন্দ্রীভবনের এই প্রবণতা বিএনপির চেয়ে আওয়ামী লীগের আমলে বেশি চোখে পড়ে।[২৫]

সুবিধা বণ্টনের কেন্দ্রীভবন ক্লোজ ডিল হলেও ডিজঅর্ডারড ছিল না। অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকৃত সুবিধা বণ্টন বাংলাদেশে খুব একটা দেখা যায় না। এগুলো মূলত নিয়ন্ত্রিত হয় স্থির ও সুশৃঙ্খল গোষ্ঠীর মাধ্যমে, তাই অর্ডারড। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে অর্ডারড ডিলের পরিবেশ থাকলে নিশ্চয়তা বাড়ে। এর ফলে যারা শুধু কার্যত নিয়মমাফিক ব্যবসা পরিচালনা করছে, তাদের জন্য অনিশ্চয়তা কমে যায়। যেসব বিদেশি বিনিয়োগকারী নিয়মের বাইরে যেতে পারে না তাদের নিজ দেশীয় আইনকানুনের ফলে, অথবা দেশীয় ব্যবসায়ী যারা নিয়মের মধ্যেই থাকতে চায়, তারা এ ব্যবস্থায় টিকতে পারে না অথবা পুরো ব্যবস্থাটি তাদের কাছে মনে হয় ক্লোজ ও ডিজঅর্ডারড। আমাদের ব্যবসায়ী তথ্যদাতাদের মতে, এমনও কিছু ঘটনা আছে, যেখানে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নিয়ম মেনে চলার কারণে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা খাত ছেড়ে এসেছে।

তৈরি পোশাক খাতে ডিলের সংক্ষিপ্ত চিত্র

রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতে ব্যক্তিগত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো ওপেন ডিলের পরিবেশ পেয়েছিল, বিশেষ করে এ শিল্পের শুরুর দিকে। ধীরে ধীরে এ চিত্র পাল্টে গিয়ে ক্লোজ ডিলের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর জুলাই ২৬, ২০১৩ সালের প্রতিবেদনে এই বিবর্তনের বিবরণ রয়েছে: '২০০৫ সালে কোটাব্যবস্থা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বিজিএমইএ ক্রমাগতভাবে তাদের নীতিপ্রয়োগের দায়িত্ব বিস্তৃত করেছে। এখন তারা রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রায় কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শুধু যেসব কারখানা এই সংগঠনের সদস্যদের মালিকানায়, সেগুলোই শুধু বুনন পোশাক রপ্তানি করার অনুমতি পায়। এই গোষ্ঠীই

কাপড় আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে এবং উৎস সনদ প্রদান করে। এই সনদ দেওয়া হয় কাপড় যে বাংলাদেশের তৈরি, তা প্রমাণ করার জন্য। দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্য এদের সালিস কমিটি আছে এবং তারা ঠিকাদারিবিষয়ক অনেকটা জটিল বিষয় পরিচালনা করে।' তৈরি পোশাক খাতের একজন ব্যক্তি উদ্যোক্তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, তার নিজেকে বিজিএমইএ নেতৃত্বাধীন ক্লোজ ডিলভিত্তিক কাঠামোর মধ্যে অধীন করে ফেলা তাই যৌক্তিক[২৬]। কারণ ওপেন ডিলের পরিবেশে টিকে থেকে বিজিএমইএ-কে এড়িয়ে রাষ্ট্রের নীতি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে শুল্কমুক্ত আমদানিপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করা স্বাভাবিক কারণেই অনেক বেশি ব্যয়সাপেক্ষ। আনুষ্ঠানিক খরচ ও সময়—দুটিই অনেক বেশি। তাই দেখা যায়, ওপেন ডিলের পরিবেশ থেকে ক্লোজ ডিলের পরিবেশে আসার এই প্রক্রিয়া অনেকটা ব্যক্তিগত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদেরই সিদ্ধান্ত।

আগেই বলা হয়েছে যে সামগ্রিকভাবে এই খাতে কার্যত ক্লোজ ডিলের পরিবেশ ছিল। এই ক্লোজ ডিলের কিছু কিছু ছিল আইনত ও আধা আইনত, যেমন শুল্কাধীন পণ্যাগার পরিকল্পনা, অর্থ প্রণোদনা, আইনসিদ্ধ নীতি অধ্যাদেশ (এসআরও) ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো খুবই বিশেষ ধরনের। একই সময়ে এই খাত এমন সব সুবিধা উপভোগ করেছে, যা অস্বাভাবিক। যেমন রাষ্ট্র এসব নিয়ম তৈরি ও বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব দিয়েছে এই খাতের সামষ্টিক ফোরাম বিজিএমইএ (বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন) এবং বিকেএমইএ-কে (বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন)। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইউডি (ইউটিলাইজেশন ডিক্লেরেশন) ও ইউপি (ইউটিলাইজেশন পারমিট) প্রদানের ক্ষমতা। এগুলো হলো শুল্ক সনদ। এর মাধ্যমে শুল্কমুক্ত আমদানিপ্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়। রাষ্ট্রের এ ধরনের কাজের ফলে আইনত ও আইনবহির্ভূত চর্চার মধ্যে পার্থক্য বিলীন হয়ে গেছে।[২৭] এদিক থেকে বিবেচনা করলে যে কেউ এসব সুবিধাকে নিয়মভিত্তিক হওয়ার বদলে কার্যত ডিলের সম্পর্কভিত্তিক বলতে পারে। কারণ, এই সুবিধাগুলো ছিল এই খাতের ক্ষেত্রে খুবই বিশেষ ধরনের। এই চিত্র থেকে তৈরি পোশাক খাতের কার্যত ক্লোজ ডিলের পরিবেশ সৃষ্টি ও টিকিয়ে রাখার সামর্থ্য বোঝা যায়। এর ফলেই এই খাত দশকের পর দশক ধরে ব্যাপক আকারে সুবিধা অর্জন করতে পেরেছে এবং চমকপ্রদ অর্থনৈতিক সক্ষমতাও অর্জন করেছে। এমন প্রাতিষ্ঠানিক ক্লোজ ডিলের পরিবেশের কারণে বৈশ্বিক বাণিজ্যের জটিল কার্যক্রম সামলাতে হিমশিম খাওয়া সরকারি কর্মকর্তাদের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা যেমন এড়াতে পেরেছে, তেমনি এসব কর্মকর্তার লাগামছাড়া দুর্নীতি ও সুবিধা আদায়ে ভরপুর বিশৃঙ্খল অর্থনৈতিক শাসনপ্রক্রিয়াও এড়াতে পেরেছে। এ ছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের চাঁদাবাজি

এড়ানোও সম্ভব হয়েছিল।

এই প্রক্রিয়ায় দুবার যাচাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। বিজিএমইএ ও শুল্ক বিভাগের বন্ড কমিশনার উভয়ই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শুল্কমুক্ত-সুবিধা যাচাই করত। এর ফলে নিয়মের অন্যথা সম্ভব হতো না।[২৮] আর তাই তৈরি পোশাক খাতের নিষ্ঠা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে এই নিষ্ঠা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। কারণ, স্থানীয় বুদ্ধিজীবী, অন্য খাতের নেতা ও শ্রমিকনেতাদের সার্বক্ষণিক সমালোচনার মুখে এই খাতকে পড়তে হতো। এমনকি তৈরি পোশাক খাতের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও বিজিএমইএর অস্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পর্কিত উদ্বেগ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা স্বীকার করে। তৈরি পোশাক খাতের একজন বড় ব্যবসায়ী বলেন যে এই খাত যথেষ্ট পরিপক্ব হয়েছে। এখন এটা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ সংস্থা বা নতুন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। পরিবর্তিত বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে তিনি বলেন, 'অবশ্যই এখানে একটি স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে...আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের কাছে বিজিএমইএর মতো একটি সংগঠন কেন বিশ্বাসযোগ্য হবে তার কোনো কারণ দেখি না (*নিউইয়র্ক টাইমস*, জুলাই ২৬, ২০১৩)।'

ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলোও তুলনামূলক ডিজঅর্ডারড ডিলের পরিবেশ থেকে পরবর্তী দশকগুলোয় দ্রুত অর্ডারড পরিবেশ হয়ে যাওয়া দেখেছে। এর আগে সত্তর ও আশির দশকে ছিল ডিজঅর্ডারড ডিলের পরিবেশ।[২৯] এই রূপান্তর সরকারের ইচ্ছায় হয়নি। রাষ্ট্রীয় কোনো নীতি সহায়তা বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হয়নি।[৩০] এটা হয়েছে আসলে বাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকা নিশ্চিত করা এবং এই খাতকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিয়ে যাওয়ার শক্তিশালী প্রণোদনার কারণে। তবে বিভিন্ন মেয়াদের সরকার-নির্বিশেষে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের 'উন্নয়ন দৃশ্যকল্প'কে খাটো করে দেখা যাবে না। স্বল্প প্রাকৃতিক সম্পদের একটি দেশে বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য উচ্চ প্রবৃদ্ধি সহজতর করাই ছিল সরকার-নির্বিশেষে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উন্নয়ন দৃশ্যকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। আমরা যে বিষয়ে জোর দিতে চাই, তা হলো বিভিন্ন উপকারী নিয়ম ও ডিলের বিভিন্ন ধরন প্রবর্তন মূলত তৈরি পোশাক খাতে কার্যকর চাহিদা ও এই খাতের দক্ষ দর-কষাকষির ফলাফল, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শক্তিশালী যৌথ কর্মকাণ্ড। এ জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়াও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এখন যে কেউ বলতে পারে, বিদ্যমান ডিলের পরিবেশ আসলে ছিল প্রণোদনার কারণে, যা এই খাতের অ্যাক্টরদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং সে জন্যই তা স্বপ্রায়োগিক (সবাই যেটা নিজের স্বার্থে মেনে চলে) ভারসাম্য বজায় রেখেছে। ওপেন ডিলের পরিবেশ দরকার ছিল, বিশেষ করে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বড়

অংশকে বৈশ্বিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম করতে এবং পোশাক জোগানদাতা হিসেবে এগুলোকে নির্ভরশীল ও সময়মাফিক হওয়ার জন্য। পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে যে বাংলাদেশ গত চার দশকে এই দুই ক্ষেত্রেই মোটামুটি সফল। অর্ডারড ডিলের পরিবেশের উদ্ভব এবং তা টিকে থাকার পেছনে মূলত তিনটি কারণ ছিল : ক. বিভিন্ন সময়ে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ক্ষমতার কারণে কার্যত নীতি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ যেমন নীতি সংস্থা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদীয় কমিটি ইত্যাদি[৩১]; খ. বিজিএমইএ (১৯৮৫) এবং পরবর্তী সময়ে বিকেএমইএর (১৯৯৬) সৃষ্টি, যা দক্ষতার সঙ্গে এই খাতের বিভিন্ন ধরনের সামষ্টিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রেখেছে, বিশেষ করে শুরুর দিকে; এবং গ. রাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর অঙ্গীভূতকরণের সন্তোষজনক মাত্রার উন্নয়ন, যেমন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে।

দশকের পর দশক ধরে তৈরি পোশাকমালিকেরা বাংলাদেশের অন্যতম শক্তিশালী ও সংগঠিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এই গোষ্ঠীর রাজনৈতিক শক্তির উৎস হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তাদের অবদান, সংসদীয় প্রতিনিধিত্বসহ রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক অঙ্গীভূতকরণ (রশিদ ২০০৮; ইয়ার্ডলি ২০১৩), এবং মালিকদের সামাজিক শ্রেণিপরিচয়। মালিকেরা মূলত সাবেক সামরিক কর্মকর্তা, আমলা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তারাই তৈরি পোশাক খাতের অগ্রদূত (রশিদ, ২০০৮; কবির ও মাহমুদ, ২০০৪)। এমন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিফলন দেখা গেছে গত তিরিশ বছরে এই খাতের অস্বাভাবিক কর-সুবিধা ও ভর্তুকি-সুবিধা প্রাপ্তির মাধ্যমে। কর-সুবিধার কথা উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আমরা এক নব্য ধনিক শ্রেণি সৃষ্টি হতে দেখেছি, কিন্তু সরকার তাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে পারে না' (*প্রথম আলো*, ১৮ মে, ২০১৩)। মন্ত্রীর এমন পর্যবেক্ষণের পর থেকে এই খাতের উৎসে কর আরও কমেছে। ২০১৩ সালে ১.২ শতাংশ থেকে কমে ০.৮ শতাংশ হয়েছে, ২০১৪ সালে ০.৮ শতাংশ থেকে কমে ০.৪ শতাংশ হয়েছে এবং ২০১৫ সালে ০.৪ শতাংশ থেকে কমে ০.৩ শতাংশ হয়েছে। একইভাবে রপ্তানিমূল্যে এই খাত যে অর্থ প্রণোদনা পেয়েছে, তা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। যেমন ২০১৪ সালে শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৫ সালে হয়েছে ১ শতাংশ (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫)। *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর (জুলাই ২৬, ২০১৩) হিসাব অনুসারে, এই খাত যে পরিমাণ ভর্তুকি ও কর বিরতি পেয়েছে, তা এই খাত থেকে প্রাপ্ত কর রাজস্ব অতিক্রম করে গেছে, যার পরিমাণ ১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই খাতের মুনাফা বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি সত্ত্বেও দশকের পর দশক এমন কর অব্যাহতি ও আর্থিক প্রণোদনা বন্ধ হয়নি।

১৯৮৫ সালে এমন অনেক কর অব্যাহতি ও আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ আকারে দেওয়া হতো।[৩২] এটা করা হতো স্থায়ী ভিত্তিতে। ফলে তৈরি পোশাক খাতের মালিকদের এই সুবিধার জন্য প্রতিবছর লবিং করতে হতো না। এসব সুবিধা নিশ্চিত করার পর বিজিএমইএর লবিংয়ের মূল নজর ছিল সুবিধা ও নীতির কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এসব লবিং বাইরে থেকে তেমন করা হতো না। বরং বিজিএমইএ সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল, যেমন এনবিআরের সঙ্গে। ফলে কর ও অন্যান্য বিষয়ে নীতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো যৌথভাবে (বিজিএমইএ ২০১০; এ ছাড়া বিজিএমইএর নেতাদের সঙ্গে আলোচনা)।

রাষ্ট্রের সঙ্গে বিজিএমইএর এমন অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক একটি বিষয় দেখলেই বোঝা যায়। যেমন বিশেষ সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হতো আইনসিদ্ধ নীতি অধ্যাদেশের (এসআরও) মাধ্যমে। এই অধ্যাদেশ এমন এক নির্বাহী সুবিধা, যার মাধ্যমে সংসদীয় যাচাই-বাছাই এড়ানো যায়। এটা করা হয় অস্থায়ী ভিত্তিতে। ফলে সহজেই সংশোধনী আনা যায় এবং সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আরও সুবিধার জন্য দর-কষাকষি করতে পারে। কিন্তু বিজিএমইএ এটাও নিশ্চিত করেছিল যে এসব অধ্যাদেশ যেন প্রজ্ঞাপন আকারে দেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট নীতি সিদ্ধান্তগুলো যেন যৌথ আলোচনার মাধ্যমে নেওয়া হয়। প্রজ্ঞাপন জারি হলে অধ্যাদেশগুলো তুলনামূলক স্থায়ী নিয়মে পরিণত হয়, কারণ বিজিএমইএ চাচ্ছিল গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো যেন পাল্টে না যায়। প্রাতিষ্ঠানিক নিষ্ক্রিয়তা বা দুর্বলতার জন্য বা আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির জন্য যখন নীতিগুলো বাস্তবায়ন করা যায় না, তখন এই প্রজ্ঞাপন প্রয়োজন হয়। এভাবেই রাষ্ট্রের সঙ্গে তৈরি পোশাক খাতের অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে পড়ার কারণে রাষ্ট্রের দুর্বল সক্ষমতা ও আমলাতান্ত্রিক অপকর্মের সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব আটকে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।[৩৩] এমন প্রোথিত নীতি প্রণয়নের সফলতা থেকে বোঝা যায় যে তৈরি পোশাক খাত বহুলাংশেই রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট নীতি প্রক্রিয়াকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল।[৩৪]

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাত ও রাষ্ট্রের মধ্যে এই অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক দ্রুত বর্ধনশীল পূর্ব এশিয়ার 'এমবেডেড অটোনমি' বা 'প্রোথিত স্বায়ত্তশাসনের' বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পূর্ব এশিয়ায় এই বাস্তবতা ছিল সত্তর ও আশির দশকে। পিটার এভানস (১৯৯৫) এই বাস্তবতা লিপিবদ্ধ করে তাত্ত্বিক ভিত্তি দিয়েছেন। পিটারের 'প্রোথিত স্বায়ত্তশাসনের' ধারণা থেকে রাষ্ট্র-ব্যবসার প্রোথিত বা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের চিত্র পাওয়া যায়। এর বৈশিষ্ট্য হলো 'উন্নয়নমূলক' রাষ্ট্রের প্রয়োজনমাফিক ব্যবসাকে শৃঙ্খলার আওতায় আনার প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন ও সক্ষমতা রয়েছে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা যদি নির্ধারিত মানের চেয়ে পারফরম্যান্স

খারাপ করে, তাহলে রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক খাত প্রধানত নীতিপ্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। এর প্রমাণ হলো কর ও বিশেষ সুবিধা, যা এই খাত পেয়ে আসছিল, তার সংস্কার করার ক্ষেত্রে এবং কারখানার মান ও নিরাপত্তা কমপ্লায়েন্স-সম্পর্কিত নিয়মকানুন ভঙ্গের জন্য এই খাতকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা।

ভবিষ্যৎ পথরেখা

বাংলাদেশে ২০১৩ সালে প্রতিযোগিতামূলক মক্কেল-তোষণবাদী পর্ব শেষ হয়েছে। এই পর্বটি প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্যে প্রোথিত ছিল। এরপর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তাকে রাজনৈতিক সমঝোতা পদ্ধতির ভাষায় বললে বলা যায় প্রভুত্ববাদী দলীয় ব্যবস্থা বা প্রভুত্ববাদী দলীয় সমঝোতা।[৩৫] পরিপক্কতায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থায় এ ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উত্থান ছিল বড় ধরনের ব্যর্থতা, বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। সুবিধার ধরন ও ডিলের পরিবেশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতায় এ পরিবর্তনের প্রভাব এত তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। কিন্তু তবু রাষ্ট্র-ব্যবসা সম্পর্ক এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর এই সম্পর্কের প্রভাব বিষয়ে কিছু প্রতীয়মান নির্দেশকের ওপর আলোকপাত করলে বুঝতে সহজ হবে। কিন্তু তা করতে হবে শর্ত সাপেক্ষে।

প্রথম বিষয় হলো কার্যত সুবিধার ব্যবস্থাপনা, যা রাজনৈতিক ভেদাভেদ-নির্বিশেষে সুবিধা ভাগাভাগির পন্থা, তা কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়। আমাদের ব্যবসায়িক তথ্যদাতাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ২০১৪ সাল পরবর্তী প্রভুত্ববাদী দলীয় সমঝোতার প্রেক্ষাপটে, রাজনৈতিক বিবেচনার কারণে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাজনৈতিক এলিটদের ডিলের ধরন ক্রমাগত প্রভাবিত হচ্ছে। উচ্চমূল্যের প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে সত্য। রাজনৈতিক এলিটদের আচরণের এসব পরিবর্তনের ফলে সম্ভবত ২০১৪ সালের আগে সুবিধা ভাগাভাগির জন্য যেসব নিয়ম ছিল, তা বদলে যেতে পারে। এর মানে হলো ডিলের পরিবেশের গতিময়তায় নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন সম্ভবত ঘটে যাবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের অনেক ব্যবসায়ী তথ্যদাতাই বলেছে যে ক্রোনি বা স্বজনতোষী পুঁজিবাদী চর্চাও চরম আকারে বেড়েছে। প্রভুত্ববাদী দলীয় সমঝোতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই স্বজনতোষী পুঁজিবাদ বেড়ে চলেছে। তবে প্রতিযোগিতামূলক পর্বের শেষের দিকেও এ ধরনের পুঁজিবাদের বৃদ্ধি দেখা গেছে[৩৬]। সংবাদপত্রের পাতায় ব্যাংক লুটের অনেক ঘটনা দেখা গেছে, যেগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের যোগসাজশ ছিল। বেসরকারি ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রেও রাখঢাক ছাড়াই স্বজনতোষী পুঁজিবাদের চেহারা দেখা গেছে।

এসব এলিট আচরণের ফলে, ভালো লাগুক আর না-ই লাগুক, কার্যত প্রভুত্ববাদী দলীয় রাষ্ট্রের 'দৃশ্যকল্প' দেখা যায়।

বর্তমানে রাষ্ট্রের উন্নয়ন কৌশল এই দৃশ্যকল্প দ্বারাই পরিচালিত। এর দুটি উপাদান দেখা যায়: রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, যা কর্তৃত্ববাদী রাজনীতি ও স্বজনতোষী পুঁজিবাদের মাধ্যমে বজায় রাখা হয়। বর্তমান সরকারের একজন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ভাবাদর্শী, যিনি আবার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর স্বনামধন্য টেকনোক্র্যাট উপদেষ্টা, তিনি অকপটে বলেছেন: 'যদি দেশে ভালো নেতৃত্ব ও স্থিতি বজায় থাকে, তাহলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবেই। গণতন্ত্রের ঘাটতি তেমন বড় কোনো সমস্যা নয়। সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া এ ক্ষেত্রে চমৎকার উদাহরণ (*প্রথম আলো*, জুন ২২, ২০১৬)। মনে রাখা প্রয়োজন যে এই উপদেষ্টার উল্লেখ করা দুটি দেশই তাদের রাষ্ট্রীয়-কর্তৃত্ববাদী উন্নয়ন ধরনের জন্য সুপরিচিত। কিন্তু একই সঙ্গে এই দুই দেশ সফলভাবে ব্যবসায়ী শ্রেণিকে শৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে পেরেছিল (কোরিয়ার জন্য দেখুন ডেভিস ২০০৪; সিঙ্গাপুরের জন্য দেখুন রোডান ২০০৪)।

এই দৃশ্যকল্পের অন্যান্য ব্যাখ্যা এসেছে একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর কাছ থেকে, যিনি আবার ক্ষমতাসীন দলের একজন স্বনামধন্য জাতীয় নেতাও। তিনি বলেন: 'আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, অতি গণতন্ত্রে নয়। শেখ হাসিনা এমন এক পথ অনুসরণ করছেন, যা মালয়েশিয়ায় মাহাথির মোহাম্মদ করেছেন। আমরা গণতন্ত্রের সেই মডেলই অনুসরণ করব (*প্রথম আলো*, মে ১৮, ২০১৫)।' এটা স্পষ্ট যে রাজনৈতিক এলিটদের কৌশলগত উন্নয়ন দৃশ্যকল্প[৩৭] দুটি জিনিসের মিশ্রণ। একটি হলো স্বজনতোষীবাদ আর অন্যটি হলো মালয়েশিয়ার দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। কিন্তু টেকনোক্র্যাট উপদেষ্টার বর্ণিত দৃশ্যকল্পে যেমনটি বলা হয়েছিল যে সিঙ্গাপুর বা কোরিয়ার 'উন্নয়নমূলক রাষ্ট্রের' অনুকরণ, এটা সে রকম নয়। এখন পর্যন্ত যা নজির দেখা যায়, তাতে বলা যায় যে এই সরকার মালয়েশিয়ার উন্নয়ন পথরেখা অনুসরণ করছে, যেখানে পরবর্তী সময়ে স্বজনতোষী পুঁজিবাদের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল (দেখুন রোডান ২০০৪ এবং সেন ও টাইস ২০১৮)।

তৃতীয়ত, সুবিধা নেওয়ার পরিধি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়। সম্ভবত বিদ্যুৎ ও বড় অবকাঠামো প্রকল্প ছাড়া রাষ্ট্র-ব্যবসা ডিলের ক্ষেত্রে এখন সুবিধাপ্রত্যাশীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে, যার ফলে বিনিয়োগ খরচ বেড়ে গেছে। এই সুবিধাপ্রত্যাশীদের মধ্যে রয়েছে রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ, নীতি সংস্থা ইত্যাদি। বর্তমানের প্রভুত্ববাদী দলীয় সরকার নির্বাচনী বৈধতার দুর্বলতার কারণে অন্তত তার ২০১৪ সালের প্রথম দিকে সরকারের মূল ক্ষেত্র যেমন দলের ঊর্ধ্বতনেরা ও সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট ছিল। এর ফলেই সুবিধাপ্রত্যাশীদের পরিমাণ সংখ্যায় বেড়েছে।

চতুর্থত, সুবিধা নেওয়ার ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। আগে এই পদ্ধতি ছিল তুলনামূলক কেন্দ্রীভূত। ক্রমেই এখন এর বিকেন্দ্রীকরণ ঘটছে। এখানেও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত যেমন বিদ্যুৎ ও বড় অবকাঠামোর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। এগুলোর ক্ষেত্রে এখনো কেন্দ্রীভূত সুবিধা বণ্টনের প্রক্রিয়াই বলবৎ রয়েছে। সুবিধাপ্রত্যাশীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার এক অনিবার্য পরিণতি হলো এই পরিস্থিতি। আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীদের এখন সুবিধাপ্রত্যাশী আমলাদের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে সমঝোতা করতে হয়। আমাদের কিছু ব্যবসায়ী তথ্যদাতা মনে করেন, সুবিধা নেওয়ার প্রক্রিয়ার এ রকম বিকেন্দ্রীকরণ ঘটতে থাকলে বর্তমানে যে শক্তিশালী, প্রণোদনামুখী ও স্বপ্রায়োগিক অর্ডারড ডিলের পরিবেশ রয়েছে, তা দুর্বল হয়ে পড়বে। এই অর্ডারড ডিল ক্লোজ হোক আর ওপেন হোক, ব্যবসায়ীরা তা দুই দশক ধরে পার করে আসছে।

পঞ্চমত, রাজনৈতিক-মতাদর্শিক পরিবর্তনও ঘটেছে। এর ফলে ব্যবসায়ীদের যৌথ কর্মকাণ্ডের সাংগঠনিক গতিময়তাও প্রভাবিত হয়েছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার তার নির্বাচনী বৈধতার ব্যাপারে সংবেদশীল। ফলে ব্যবসায়ী সংগঠনসহ সিভিল সমাজের ওপর তার রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করেছে। এর ফলে দ্বিদলীয় অবস্থান যেটা আগে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো বজায় রাখতে পারত, তা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, ব্যবসায়ী নেতাদের সমালোচনামুখর কণ্ঠস্বর অনেকটা বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিদলীয় অবস্থান ব্যবসায়ীরা মেনে চলত। ফলে সরকার পরিবর্তন হলে তার সঙ্গে ব্যবসায়ীরা মানিয়ে নিতে পারত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ব্যবসায়ী নেতৃত্ব এই কৌশলের প্রাসঙ্গিকতা হারাতে বসেছে। বিদ্যমান ডিলের পরিবেশে টিকে থাকা ও উন্নতি করতে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর দর-কষাকষির সক্ষমতা দরকার। ওপরে বর্ণিত রাজনৈতিক-মতাদর্শিক পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব নিশ্চিতভাবেই বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। এটা নির্ভর করবে বিভিন্ন ব্যবসা খাতের সামষ্টিক ফোরামগুলোর রাজনৈতিক শক্তির ওপর।

ব্যক্তিগত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের জন্য এ ধরনের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা দেখা যায় বিশেষ করে উচ্চমূল্যের ডিলের সময়। আগেই বলা হয়েছে যে ২০১৪ সালের আগে ভিন্ন রাজনৈতিক পরিচয় সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাউকে মুখপাত্র বা ফ্রন্ট পারসন বানিয়ে চুক্তি আদায় করতে পারত। কিন্তু ২০১৪ সাল-পরবর্তী রাজনৈতিক আবহে ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ মতাদর্শিক সহমতই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক এলিটদের পছন্দনীয়। আগের সেই কৌশল এখন আর তাই কার্যকর নয়। এর ফলে দেখা যায়, যেসব ব্যবসায়ীর ভিন্ন রাজনৈতিক পরিচয় আছে বা দলনিরপেক্ষ, তারা ব্যবসায়িক অংশীদারত্বে ছোট

অংশীদার হতে বাধ্য হয়। এসব ব্যবসায়িক অংশীদারত্বে নেতৃত্বের আসনে শুধু ক্ষমতাসীনদের সমর্থনপুষ্টরাই থাকে। তাই রাজনৈতিকভাবে শুদ্ধ ব্যবসায়িক জোট গঠন এই নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বেড়েছে, যেখানে ক্ষমতাসীন এলিটদের মতাদর্শের সঙ্গে আরও বেশি সহমত পোষণ করতে হয়। সম্ভবত কৌশলগত এই পরিবর্তনের সংশোধিত ধরনের কারণে রাষ্ট্র-ব্যবসার ডিলের ক্ষেত্রে এই পর্যন্ত বিদ্যমান যেই ডিলের সম্পর্কের অর্ডারড ধরন ছিল, তা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। তবে আওয়ামী লীগ সরকার স্বল্প সময়ের মধ্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। সে জন্য এটা সম্ভব যে রাজনৈতিক এলিটরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ডিলের ক্ষেত্রে শিগগিরই তাদের আক্রমণাত্মক মতাদর্শগত অবস্থান কিছুটা কমাবে। কম মূল্যের চুক্তির ব্যাপারে পুরোনো কৌশল এখনো কার্যকর বলেই মনে হয়।

এটা ঠিক যে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমান রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারে উদ্বেগ আছে। যেমন এই সমঝোতার ধারাবাহিকতা, দুর্বল বৈধতা, রাজনৈতিক ধাক্কার অনিশ্চিত ধরনের কারণে বিপন্ন হওয়া, রাজনৈতিক ও সরকারি এলিটদের ক্রমাগত লুণ্ঠনমূলক আচরণ এবং সুবিধা নেওয়ার প্রক্রিয়া আরও বেশি বিকেন্দ্রীকৃত হওয়ার ফলে এ পর্যন্ত যে শক্তিশালী অর্ডারড ডিলের পরিবেশ ছিল, তা টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা। তবে এই সমঝোতার কারণে ২০১৪ সাল থেকে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রের দমনমূলক রাজনৈতিক পদক্ষেপের কারণে দেশব্যাপী কোনো ধরনের হরতাল বা রাজপথ অবরোধের ঘটনা ঘটেনি। এর ফলে অন্য অনেক বিষয়ের মধ্যে সম্প্রতি উচ্চ ও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির হার রক্ষা করা গেছে।

প্রবৃদ্ধির সক্ষমতার ভবিষ্যৎ প্রবণতা মূল্যায়ন করতে হলে এসব ইতিবাচক এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া লুপের আলোকে তা করতে হবে, যা ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাপক রাজনৈতিক ও সুনামের সংকট থাকা সত্ত্বেও তৈরি পোশাক খাত মোটামুটি ভালো করছে। সুনামের সংকটের মধ্যে আছে রানা প্লাজা ধস[৩৮], উচ্চ মজুরির জন্য শ্রমিক আন্দোলন, কারখানার মান ও সামাজিক কমপ্লায়েন্স ও শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার বিষয়ে প্রচণ্ড বৈশ্বিক চাপ, যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি কোটা হারানো ইত্যাদি। পূর্ববর্তী দশকগুলোতেও এই খাতের অভ্যন্তরীণ অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু তবু এই খাতের ভালো করার পেছনে কারণ ছিল ক্লোজ/সেমি-ক্লোজ/অর্ডারড (সামষ্টিকভাবে) এবং কার্যত ক্লোজ-অর্ডারড ডিলের সম্মিলনীর কারণে। এটা ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক খাতের মালিক ও রাজনৈতিক ভেদাভেদ-নির্বিশেষে রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে একটি শক্তিশালী ও দৃঢ় শ্রমিক-বিরোধী এলিট রাজনৈতিক সমঝোতা[৩৯] ছিল। এর ফলে এই খাত ক্রমাগত আন্দোলন ও

সমালোচনা সামাল দিতে পেরেছে। এসব সমালোচনা স্থানীয় ও বৈশ্বিক শ্রমিক, গণমাধ্যম ও মানবাধিকারকর্মীদের কাছ থেকে এসেছিল। এই সমঝোতা পরবর্তী সময়ে ক্রমেই অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়ে। এ ক্ষেত্রে রানা প্লাজা ধস সম্ভবত ইঙ্গিতবাহী ছিল। খুব স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, এ পর্যন্ত বিরাজমান সমঝোতার সংকটের তিনটি দিক রয়েছে: কারখানার নিরাপত্তা ও মান, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ এবং শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার।

এটা বলা যায় যে বিজিএমইএ দ্রুতই অর্থনৈতিক ও সুনামের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে। এই চ্যালেঞ্জ এসেছে নতুন আবির্ভূত রাজনৈতিক জোটের মাধ্যমে। এই জোটে রয়েছে সংগঠিত শ্রমিক, গণমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী, অধিকারভিত্তিক এনজিও এবং বহু আন্তর্জাতিক অ্যাক্টর। এর মধ্যে শক্তিশালী বৈশ্বিক ক্রেতারাও অন্তর্ভুক্ত। ফলে এ পর্যন্ত তৈরি পোশাক খাতের যে 'প্রতিরোধক্ষমতা', তা হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। বিজিএমইএ তার জাতীয় ও বৈশ্বিক সুনাম উদ্ধারে মনোযোগী হয়েছে[৪০], এবং কারখানার নিরাপত্তাবিষয়ক বৈশ্বিক মানের সংস্কার বাস্তবায়নে সম্মত হয়েছে[৪১]। এর মাধ্যমে সংগঠনটি অসাধু তৈরি পোশাকমালিকদের সক্রিয়ভাবে নজরদারি করা শুরু করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব মালিকের সঙ্গে বিজিএমইএর সম্পর্ক নেই বলেও জানিয়ে দেয়। কারণ, এসব মালিক এই খাতের শাসনপ্রক্রিয়ার জন্য প্রত্যাশিত সংস্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই শাসনপ্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে কারখানার নিয়মনীতির বিষয়ে কঠোর কমপ্লায়েন্স এবং নিরাপত্তা ও কারখানার মানের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।[৪২] ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর ব্যাপারে বিজিএমইএ সম্মত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে মজুরি সমন্বয়ের জন্য স্থায়ী কমিশন করে দিয়েছে। কিন্তু কোনো ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন সৃষ্টির ব্যাপারে তারা কোনো ধরনের চাপের কাছে নতিস্বীকার করেনি। ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক ট্রেড ইউনিয়ন, অধিকারভিত্তিক সিভিল সমাজ এবং বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে চাপ ছিল। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জিএসপি-সুবিধা বাতিল করেছিল। এখনো তারা সেই বাতিল আদেশ তুলে নিতে চায় না। বিবাদের মূল কারণই ছিল আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার দিতে রাষ্ট্রের প্রচণ্ড অনীহা।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, দশকের পর দশক যেই ক্লোজ ও সেমি-ক্লোজ ডিলের পরিবেশ ছিল, তা এখন রাষ্ট্র এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক অংশীজনদের প্রশ্নের সম্মুখীন। এ ধরনের যেকোনো নীতির সংস্কার উদ্যোগের ব্যাপারে বিজিএমইএ কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছে। অতীতে এ ধরনের নীতি সংস্কার উদ্যোগ অনেকবার বিজিএমইএ বানচাল করতে পেরেছে। সংগঠনটির এ ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতার ফলে এটা প্রমাণিত যে এ পর্যন্ত বিরাজমান এলিট রাজনৈতিক সমঝোতা

অত্যন্ত শক্তিশালী। তবু এই খাত কিছু সংকটের সম্মুখীন। এই খাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং ২০২১ সালের মধ্যে রপ্তানির আকার বার্ষিক ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নিয়ে যাওয়ার যে দৃশ্যকল্প, তা অনেকাংশেই নির্ভর করবে কী ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতা এবং ডিলের পরিবেশ গড়ে ওঠে, তার ওপর। কারণ, এর মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে তারা রাজনৈতিক এলিটদের সঙ্গে পুনরায় দর-কষাকষি করতে সক্ষম হবে কি না। তা ছাড়া এই খাতের মালিকদের ওপর 'লোভী' ব্যবসায়ী, 'অর্থনৈতিক অন্যায়ের' ধ্বজাধারী এবং 'শ্রমিক অধিকার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীর' যে তকমা আছে, সেটা কীভাবে কাটিয়ে উঠবে, তা-ও নির্ভর করবে।

উপসংহার ও পর্যবেক্ষণ

এই লেখায় প্রবৃদ্ধির যেই সময়কাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেই সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থায় ক্রমেই মৌলিক সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার ক্ষয় হয়েছে (১৯৭২-১৯৯০)। সেই ক্ষয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, তেমনি হয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। এই সময়ে পেন্ডুলাম শিফট প্রতিফলিত হয়েছে রাজনীতিতে। আর প্যারাডিম শিফট দেখা গেছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে। মানে রাজনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার পরিপক্বতার দিকে এগিয়ে আবারও পেছনে ফিরে গেছে। কিন্তু এই সময়কালে যদি প্যারাডিম শিফট প্রদর্শিত হতো, মানে একটি ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার পর অবনতির সম্ভাবনা কম থাকত, তাহলে মৌলিক সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থায় যে অগ্রগতি হয়েছিল, তা সংহত হতে পারত। এ রকম পেন্ডুলাম শিফট অর্থনীতির চেয়ে রাজনীতির গতিময়তায় বেশি দেখা গেছে। মৌলিক সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থায় অর্থনীতিতে পরিপক্বতার দিকে একটি দৃঢ় অগ্রগতি দেখা গেছে এবং এর ফলে প্যারাডিম শিফট প্রদর্শিত হয়েছে। এই অগ্রগতি প্রথম আওয়ামী লীগের শাসনামলে শুরু হয়েছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিপক্বতায় পৌঁছানোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অর্ডারড ডিলের পরিবেশ বজায় থাকা, যার ফলে একটি স্থায়ী স্বপ্রায়োগিক ভারসাম্যে পৌঁছে যায়। রাজনীতিতে পেন্ডুলাম শিফট হওয়া সত্ত্বেও এই ডিলের পরিবেশে একটি এলিট রাজনৈতিক সমঝোতা ছিল এবং জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থাও বিরাজ করছিল। আমরা বিশ্বাস করি যে অর্ডারড ডিলের পরিবেশের এ রকম স্থায়িত্ব ক্ষমতা থাকায় প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গেছে। এই পরিবেশ হোক ক্লোজ বা ওপেন, যেই সময়কালের আলোচনা করা হচ্ছে, সেই সময়ে এই স্থায়িত্ব ক্ষমতার ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে।

১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক রূপান্তর শুরু হওয়ার পর সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থা আধা পরিপক্বতায় প্রবেশ করেছে। আগেই বলা হয়েছে যে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে জটিল গতিময়তা বাংলাদেশের সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। আর তা ১৯৯১ সালের পর থেকে প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক সমঝোতার পর্ব শুরু হওয়ার সময়েই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, খুবই দুর্বল 'রাজনৈতিক উন্নয়নের' চিত্র। এর ফলে স্বপ্রায়োগিক ভারসাম্যে বা এলিট রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। ফলে ২০১৪ সালে তৈরি হয় প্রভুত্ববাদী দলীয় অবস্থা বা সমঝোতা। জনগণ আশা করেছিল, এই সময়কালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্যারাডিম শিফট হবে। কিন্তু ঘটেছে পেন্ডুলাম শিফট—২০০৭ সালে পরোক্ষ সামরিক অভ্যুত্থান এবং স্বভাবতই ২০১৪ সালে প্রভুত্ববাদী দলীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাব।

মৌলিক সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্ডারড ডিলের পরিবেশও টিকে গিয়েছিল এই আধা পরিপক্ব পর্বে। আর তা টিকে গিয়ে স্বপ্রায়োগিক ভারসাম্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর লক্ষণ দেখা যায় বিভিন্ন এলিট গোষ্ঠীর মধ্যে শক্তিশালী সহযোগিতার মাধ্যমে, যা ব্যবসায়ীদের প্রতিও কার্যত বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতির আভাস দিয়েছিল। এর মাধ্যমে বিনিয়োগের লাভ আসার যে সময় পরিধি, তা আরও দীর্ঘায়িত হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত, তার আগের সময়ের চেয়ে এই সময়ে এলিটদের সহযোগিতা অর্থনৈতিক শাসনপ্রক্রিয়া বৃদ্ধি করে প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া ধরে রাখতে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আর এই সময়ে বেসরকারি খাত ছিল অনেক বেশি বড়, জটিল, স্পন্দনশীল, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত এবং পরিপক্ব। এই পর্বে পরিপক্বতার দিকে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট অগ্রগতি করেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় কার্যত 'স্টেকহোল্ডারদের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থার' (সবাই যেটা নিজের স্বার্থে মেনে চলে) উদ্ভব ও সংহতকরণের মাধ্যমে। এর ফলে এখানে আসলে একটি স্বপ্রায়োগিক ও প্রণোদনামুখী সমঝোতার অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে। এর থেকেই ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং রাষ্ট্র ও ব্যবসার মধ্যে একটি পারস্পরিক লাভের সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি হয়। এ ক্ষেত্রে 'নিয়মমাফিক ব্যবস্থা' ব্যবহার না করেই তা সম্ভব হয়েছে। যেমন চুক্তিভিত্তিক তৃতীয় পক্ষ বলবৎ হওয়া, যা আবার উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এসব স্টেকহোল্ডারের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা পছন্দনীয় হওয়ার কারণ হলো নিয়মমাফিক ব্যবস্থা এখনো তেমন শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি, যা সংশ্লিষ্ট ডিল প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীদের[৪৩]একধরনের স্থিতিশীলতা ও নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে (হাসান ২০১৩; এ ছাড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা)[৪৪]। স্টেকহোল্ডারদের কাছে

গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থার এমন বিকাশ আমাদের মতে একটি শক্তিশালী অর্ডারড ডিলের পরিবেশের ঘাটতি থাকলে সম্ভব হতো না। এ ব্যবস্থার শক্তিশালী অবস্থা এবং অর্ডারড ডিলের পরিবেশের স্থায়িত্ব ক্ষমতার কারণে কার্যকরভাবে একটি পারস্পরিক লাভের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে টিকে আছে। এই পারস্পরিক লাভের পরিবেশের ভিত্তি হলো একটি সম্মিলিত ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বিভিন্ন এলিটদের মধ্যে সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র-ব্যবসা সম্পর্ক। এটাই সম্ভবত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বড় উল্লম্ফন এনে দিয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, রাজনৈতিক ভেদাভেদ-নির্বিশেষে অর্ডারড ডিলের প্রতি রাজনৈতিক এলিটদের প্রতিশ্রুতির ভিত্তি মূলত বেশ কিছু বিষয়ের সংমিশ্রণ। এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক এলিটদের মতাদর্শ ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। আর এসবের মূলে রয়েছে বিভিন্ন ব্যবসায়ী এলিটদের বিদ্যমান কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের প্রণোদনা। সত্তরের দশকের শেষের দিকে রাজনৈতিক এলিট ও রাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা বাজারভিত্তিক প্রবৃদ্ধির জন্য তাদের প্রচণ্ড মতাদর্শিক পছন্দকে গুরুত্ব দিয়েছে। 'অনুদার' শাসনপদ্ধতির কারণে তাদের গণতান্ত্রিক বৈধতা ছিল ভঙ্গুর। তাই তাদের মনে হয়েছে যে একই সঙ্গে তাদের উন্নয়নমূলক বৈধতা[৪৫] নির্মাণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ফলে অর্থনৈতিক কার্যক্ষেত্রে একধরনের নিশ্চয়তা ও স্থিতিশীলতা প্রদানের মাধ্যমে তারা প্রাকৃতিক সম্পদহীন একটি দেশের বেসরকারি খাতকে গড়ে তুলতে প্রণোদনা দিয়েছে। এ ছাড়া ধীরে ধীরে, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবেও শক্তিশালী হয়েছে, যার নজির দেখা গেছে বেশ কিছু বিষয়ের ওপর ব্যবসায়ীদের প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে। যেমন নীতি প্রণয়ন, দল, সংসদ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং এর ফলে কার্যত খাড়াখাড়ি বা উল্লম্ব রাজনৈতিক একীভূতকরণ ঘটেছে (ভার্টিক্যাল পলিটিক্যাল ইন্টিগ্রেশন)। এর মানে হলো '...সরকার ও সম্পদের মালিকের মধ্যকার সীমারেখা মুছে ফেলা...' (হ্যাবার, রাজো, মৌরার ২০০৩, পৃ. ৩১)[৪৬]।

এ বিষয়টি কিছু খাতে আরও বেশি শক্তিশালী ও আধা প্রাতিষ্ঠানিক রূপে দেখা যায়, যেমন তৈরি পোশাক খাতে এবং অন্যান্য খাতে দেখা যায় অ্যাডহক বা তরল আকারে, যেমন আবাসন, ওষুধ ও টেক্সটাইল। অর্ডারড ডিলের পরিবেশও এসব একীভূত হওয়ার একটি ফলাফল। ব্যবসায়ীরাও এই অর্ডারড ডিলের পরিবেশ অর্থ দিয়ে কিনেছে বলা যায়। রাষ্ট্রীয় সেবার একধরনের 'বাজার' এই সময়ে বিদ্যমান ছিল, যা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর জন্য বেশ ভালোই কাজে লেগেছে। যদিও রাষ্ট্রীয় সেবা অর্থ দিয়ে কেনার ফলে লেনদেনের খরচ বেড়ে যেত, কিন্তু এর ফলে ডিলের পরিবেশ অর্ডারড ছিল এবং লেনদেনের সময়ও কম লাগত। রপ্তানিকারকদের জন্য সময় বাঁচানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায় একটি 'বেআইনি' পদ্ধতিতে, ক্রমাগত

দলীয় ও একচ্ছত্রভাবে নন-মেরিটোক্র্যাটিক বা অমেধাভিত্তিক এবং ক্লেপটোক্র্যাটিক বা দুর্নীতিপরায়ণ আমলারা একটি প্রবৃদ্ধি বর্ধনমূলক শাসনপ্রক্রিয়ার পরিবেশ বজায় রেখেছিল।

ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আগের আলোচনায় বলা হয়েছে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জিরো-সাম গেম বা বিজয়ীর সব পাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু তারপরও বিরোধী দলের এবং দলনিরপেক্ষ ব্যবসায়ীরাও সুবিধাবাদী জোট/সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অর্ডারড ডিল আদায় করতে পারত, যা তারা ধীরে ধীরে অর্জন করেছিল। এখন এটা দেখার বিষয় যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং শাসনপ্রক্রিয়ার এমন মান থেকে তা কাঠামোগত রূপান্তরের দিকে যায় কি না। প্রতিষ্ঠান ও শাসনপ্রক্রিয়ার বিদ্যমান মানের মাধ্যমে এই পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রশংসনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে[৪৭]। কিন্তু উচ্চতর প্রবৃদ্ধির হার অর্জন ও প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার ক্ষেত্রে এই কাঠামোগত রূপান্তর প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. এই শব্দের মাধ্যমে বোঝানো হয়, যখন একটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও ধনী কৃষকদের যৌথ একটি জোটের কাছে। প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের একজন স্বনামধন্য সদস্য আওয়ামী লীগের প্রথম শাসনামলের ধরন বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন (সোবহান ও আহমেদ ১৯৮০)।

২. বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠনের মধ্য দিয়ে একদলীয় রাষ্ট্র গঠন।

৩. এই পর্বের গবেষণালব্ধ বিস্তারিত বোঝার জন্য দেখুন আলি (২০১০) এবং উল্লাহ (২০১৬)।

৪. মাল্টে ক্যাবনার (২০১৪) একনায়ক ও প্রতিযোগিতামূলক দুই ধরনের ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই প্রভুত্ববাদী দলীয় ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন: 'একনায়কতান্ত্রিক শাসনে প্রভুত্ববাদী দলীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছু বহুত্ববাদী বা গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিন্তু স্পষ্টত তা উদার গণতান্ত্রিক নয় এবং প্রতিযোগিতামূলক দলীয় ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা বা তা সহ্য করতে অক্ষম। তবে প্রতিযোগিতামূলক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই প্রভুত্ববাদী দলীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছু উদার গণতান্ত্রিক নিয়ম দেখা যায়। কিন্তু তবু ক্ষমতার পালাবদলের ঘাটতি বেশ ভালোই থাকে' (পৃ. ৩২)। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পথচলার বিভিন্ন সময়ে প্রভুত্ববাদী দলীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনেকটা একনায়কতান্ত্রিক ধাঁচ ধারণ করেছিল।

৫. এই পর্ব ও তার বাইরেও অন্যান্য পর্বের জন্য সিদ্ধান্ত প্রণয়নে দাতাগোষ্ঠীর ভূমিকা বিষয়ে সোবহানের (১৯৯০) বিভিন্ন প্রবন্ধ দেখুন।

৬. বিভিন্ন আইন করে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম সীমিত করে দেওয়া প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল 'সমাজতান্ত্রিক' আওয়ামী লীগ শাসনামলে (১৯৭২-১৯৭৫)। কিন্তু এই সীমিতকরণ আরও শক্তিশালী করা হয়েছে জেনারেল জিয়ার সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনামলে। মজার ব্যাপার হলো, জিয়ার শাসনামলের শেষের দিকে এসে (প্রভুত্ববাদী দলীয় শাসনামলে) আবার আইন করে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে এই পর্বে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থায় জটিল গতিময়তার দিকটি দেখা যায়। বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন ও

শ্রম আইনসংক্রান্ত আইনের উদ্ভব বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন (ফারুক ২০০৯)। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রভুত্ববাদী শ্রমিকবিরোধী এলিট রাজনৈতিক সমঝোতার আবির্ভাবের (রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে) জন্য প্রতিবন্ধক আইনের চেয়ে শ্রমিকদের দুর্বল রাজনৈতিক ক্ষমতা বেশি দায়ী। আর তা রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই। এ ধরনের সমঝোতার শক্তি-সামর্থ্য এখনো রয়েছে। সেটা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক—দুই ভাবেই। তবে মাঝেমধ্যে রাজনৈতিকভাবে ধাক্কা খায়নি, তা বলা যাবে না। তবে সম্প্রতি তা ক্রমাগত দুর্বল হচ্ছে (তৈরি পোশাক খাতের প্রেক্ষাপটে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে)।

৭. সোবহান ১৯৯৩ এবং ইসলাম ও সিদ্দিক ২০১০।

৮. এরশাদের স্বজনতোষী বা ক্রোনি পুঁজিবাদ তৈরি পোশাক ও অন্যান্য শিল্প খাতে প্রান্তিকভাবে আক্রান্ত করেছিল।

৯. রশিদ ২০০৮।

১০. ২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর মন্তব্য।

১১. লেভি (২০১৪; পৃ. ২৭) রাজনৈতিক সমঝোতা ও সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক সমঝোতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তা নিম্নরূপ: 'প্রতিযোগিতামূলক সমঝোতা এমন একটি সমন্বয়, যেখানে শাসক ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে সহিংসতার সম্ভাবনার পার্থক্য অনেক সীমিত হয়ে আসে। যেমন ক্ষমতাসীন দল হতে পারে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত এবং ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন অংশও হতে পারে শক্তিশালী। এই সমন্বয় থাকলে বিরোধীদের দিক থেকে স্থিতাবস্থা চ্যালেঞ্জ করতে অনেক কম প্রতিশ্রুতি থাকলেই চলে।'

১২. এটা ভারতের উল্টো। ভারতের অবস্থা পরিপক্ব সীমিত সুবিধার অবস্থার শ্রেণিতে পড়বে, যদিও 'দুর্বল' (রায়, ২০১৩)।

১৩. রাষ্ট্রনির্মাণ বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক সংগঠনের বিকাশ এবং বৈধ রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ সক্ষমতার সংহতকরণ। এই সময়কালে বাংলাদেশে আশানুরূপ রাজনৈতিক উন্নয়ন না হওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য দেখুন হাসান ২০১৩।

১৪. বাংলাদেশের এলিট রাজনৈতিক সমঝোতা কীভাবে গণতন্ত্রায়ণ, বেসরকারি খাতের শাসনপ্রণালি/ব্যবস্থা এবং সামাজিক খাতে প্রভাব ফেলে, সেই প্রেক্ষাপটে দলীয় তন্ত্রের ওপর গবেষণালব্ধ আলোচনার জন্য দেখুন হাসান (২০১৩) এবং বাংলাদেশের স্থানীয় শাসনপ্রণালি ও আইনের শাসনের জন্য দেখুন হাসান ও অন্যান্য (২০১৪); এবং বাংলাদেশে দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় পুলিশ সংস্কার ব্যাখ্যা করার জন্য এই ধারণার ব্যবহার বুঝতে দেখুন বিশ্বাস (২০১৬)।

১৫. সমঝোতার জন্য সুপরিচিত সিভিল সমাজের অংশ, জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছ থেকে চাপ এসেছিল। এলিটদের দর-কষাকষির প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতা করেছিল আন্তর্জাতিক বিশিষ্টজনদের কাছ থেকে, যেমন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট কার্টার তাদের মধ্যে অন্যতম।

১৬. বিশ্লেষণের জন্য দেখুন হাসান ২০১৩। এখানে রাজনৈতিক সমঝোতা ও সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থাপদ্ধতি ব্যবহার করে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সরকারের ধারাবাহিকতা কীভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হবে, সেটা নিয়ে এলিট দ্বন্দ্বের জটিল প্রক্রিয়া (১৯৯৪-৯৫), এ সম্পর্কিত একটি এলিট সমঝোতার

উদ্ভব (১৯৯৬), এই সমঝোতার ভেঙে পড়া (২০০৬), সামরিক বাহিনী-সমর্থিত টেকনোক্র্যাট সরকারের মাধ্যমে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা (২০০৭-০৮) এবং এর সর্বশেষ আবার ভেঙে পড়া (২০১২)। ২০১২-পরবর্তী রাজনীতিতে এলিট সমঝোতার অবস্থা বুঝতে দেখুন হাসান ও নাজনীন (২০১৭)।

১৭. আরও দুটি কারণ উল্লেখ করা প্রয়োজন: প্রথমত, রাজনৈতিক এলিটদের কর বাড়ানোর শক্তিশালী প্রণোদনা রয়েছে। তাই রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে ব্যবসাকে রক্ষা করতে সহজেই রাজনৈতিক এলিটরা রাজি হয়। দ্বিতীয়ত, ২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে বহু রাজনৈতিক এলিট নিজেরাই ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে। ফলে ব্যবসাবান্ধব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যায়।

১৮. নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক আইনবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার মাধ্যমে এ রকম হস্তক্ষেপ বহুগুণ বেড়ে যায়।

১৯. স্টেশনারি ও রোভিং ব্যান্ডিটের ধারণা নেওয়া হয়েছে ওলসনের (১৯৯৩) কাছ থেকে।

২০. পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রভুত্ববাদী দলীয় রাষ্ট্রে 'আইনের দ্বারা শাসনের' অনুদার চর্চা শাসনকাঠামো প্রক্রিয়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে বিশ্লেষণের জন্য দেখুন জয়সুরিয়ার (১৯৯৯) বিভিন্ন প্রবন্ধ।

২১. তৈরি পোশাক খাতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক পর্বের শেষ ভাগে এবং তার বাইরেও বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক অ্যাক্টরদের নজরদারি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

২২. দেখুন হাসান ২০১৩।

২৩. ক্ষমতাসীন জোটের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দেশ্য হলো উন্নয়নমূলক বৈধতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা।

২৪. রাজনৈতিক দল ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত দলীয় অংশগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের জন্য জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক এলিটদের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বোঝানো হচ্ছে। আর তা করা হয় নিচের স্তরে পৃষ্ঠপোষকতার ভাগ বণ্টন করার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়া হয় 'রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীগুলোকে' (গেডেস ১৯৯৪)। এর মানে হলো দলের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাইকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া।

২৫. বিস্তারিত পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

২৬. এই সুযোগ তাত্ত্বিকভাবে রয়েছে।

২৭. একজন স্বনামধন্য বাংলাদেশি আইনজীবীর পর্যবেক্ষণ: 'দেশের আইন অনুযায়ী বিজিএমইএর কোনো নীতিসংশ্লিষ্ট কর্তৃত্ব নেই। এটা পোশাকশিল্পের ক্লাবঘর (*নিউইয়র্ক টাইমস*, জুলাই ২৬, ২০১৩)।'

২৮. বিজিএমইএর পরিচালকদের সঙ্গে আলোচনা।

২৯. তৈরি পোশাক খাতের শুরুর দিকে কীভাবে তারা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ নীতি ও আমলাতান্ত্রিক বাধার প্রভাব মোকাবিলা করেছে এবং কীভাবে রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং প্রশাসনিকভাবে ভালোভাবে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে উদ্যোগ নিয়ে এ ধরনের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হয়েছে, যার ফলে অনেক বেশি অর্ডারড ডিলের পরিবেশ এবং প্রাতিষ্ঠানিক নীতি প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছে, তা জানতে দেখুন রশিদ (২০০৮)।

৩০. তৈরি পোশাক খাতের প্রেক্ষাপটে আহমেদ, গ্রিনলিফ ও স্যাকস (২০১৪) সঠিকভাবেই তুলে ধরেছেন: '...অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের বিপরীতে, বাংলাদেশে প্রত্যেক দলের (আওয়ামী

লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি) শিল্পনীতি তুলনামূলকভাবে রাষ্ট্রকে বাজারের ওপর কম হস্তক্ষেপ করার কথা বলে।' (পৃ. ২৬২)।

৩১. দেখুন রশিদ (২০০৮); হোসেইন (২০১১)।

৩২. এস.আর.ও. ১৫৪-এল/৮৫/৯১৪/সিইউএস, ৩০ মার্চ ১৯৮৫।

৩৩. ব্যবসার এ রকম সুরক্ষার কারণে তৈরি পোশাক খাতে লেনদেনের খরচ কমানো গিয়েছিল (ফলে একধরনের কার্যত বাড়তি সুবিধা সৃষ্টি হচ্ছিল), যা অন্য অনেক খাতে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তার কারণ ছিল অন্য খাতে এমন ক্লোজ ডিলের পরিবেশ না থাকা।

৩৪. সাক্সেনার পর্যবেক্ষণ : 'বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ সুবিধাজনক নীতির কার্যকর সমর্থক এবং সরকারি কর্মকর্তাদের এত ঘনিষ্ঠ হওয়ায় সমালোচিত (সাক্সেনা ২০১৪; পৃ. ১০৬)।'

৩৫. সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভুত্ববাদী দলীয় সমঝোতার খুবই দরকারি সংজ্ঞা দিয়েছেন লেভি (২০১৪; পৃ. ২৬) : 'প্রভুত্ববাদী দলীয় সমঝোতা এমন একটা সমন্বয়, যেখানে শাসক ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে সহিংসতার ক্ষমতার পার্থক্য অনেক বেশি। ক্ষমতায় শাসক দলের গ্রাস এতই বেশি এই অর্থে যে বিরোধী শক্তি যদি স্থিতাবস্থা চ্যালেঞ্জ করতে চায়, তাহলে তাদের অসাধারণ মনোবল দরকার পড়বে।

৩৬. একটি স্বনামধন্য জাতীয় দৈনিকের পর্যবেক্ষণ : 'দুর্ভাগ্যক্রমে, দায়মুক্তির কারণে আইনের শাসনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গেছে এবং ক্রোনি বা স্বজনতোষী পুঁজিবাদের মাধ্যমে দুর্নীতি বহুগুণে বেড়েছে (*ডেইলি স্টার*, ২৬ মার্চ, ২০১৩)।'

৩৭. এটা এই অর্থে কৌশলগত যে এই 'দৃশ্যকল্প' নিজেই অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার একটি ফলাফল।

৩৮. সাম্প্রতিক ইতিহাসে রানা প্লাজা ধসের ঘটনা একটি জঘন্যতম শিল্পদুর্যোগ হিসেবে বিবেচিত, যার ফলে ১১ শতাধিক শ্রমিক নিহত হন।

৩৯. তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকবিরোধী রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য দেখুন আহমেদ, গ্রিনলিফ ও স্যাকস (২০১৪); হাসান (২০১৩)। সাম্প্রতিক চিত্র তুলে আনা হয়েছে শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে।

৪০. প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে এবং নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের এজেন্ট হিসেবে যে সুনাম তৈরি পোশাক খাতের, সেই সম্পর্কে এই খাতের মালিকদের বর্তমান উপলব্ধি হলো এ রকম যে এই সুনাম কিছুটা কমেছে। আর তার কারণ হলো মানবাধিকার ও আইনের শাসনের বিষয়ে ঘাটতি। এ বিষয়ে অনেকাংশেই ভয় দেখানো, উদ্ধত এবং খারাপভাবে এই খাত চালানোর ব্যাপারে কোনো ধরনের বিবেকের দংশন না থাকার কথা তাঁরা বলেছেন। এই খাতের একজন স্বনামধন্য মালিক বেশ কড়া ভাষায় বলেছেন : 'তাজরীন ও রানা প্লাজা ধসের পর এই খাতকে ঘৃণা করা অনেক সহজ। তার ওপর যদি জনপ্রিয় জনবান্ধব বুদ্ধিজীবীরা সেই ঘৃণাকে সমর্থন করেন, তাহলে পুরো আন্দোলন আরও গতি পায়। যদি অন্যান্য খাত ও অন্যান্য খাতের ব্যবসায়ী যাঁরা সরকারের এলিটদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, তাঁরা যদি ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন, তাহলে তৈরি পোশাক খাত কীভাবে সব সময় ঘৃণার শিকার হয়? অথচ এই খাত রপ্তানি খাতের ৮০ শতাংশ এবং ২ কোটি মানুষকে সরাসরি সহায়তা করছে... (*ডেইলি স্টার*, নভেম্বর ১৬, ২০১৬)।'

৪১. দুটি বড় সংস্কারমূলক হস্তক্ষেপ ছিল অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন লাবোভিৎজ ও বাউম্যান-পাউলি (২০১৫); যাযাক (২০১৫); এবং সাক্সেনা (২০১৪)।

৪২. বিজিএমইএ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা।

৪৩. আমরা এখানে বোঝাচ্ছি মূলত অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহ, কারণ বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আনুষ্ঠানিক চুক্তিভিত্তিক শাসনকাঠামোর সুবিধা তুলনামূলক বেশি পায়।

৪৪. 'অনুগত বা অ্যাডহেরেন্ট' ও 'চুক্তিভিত্তিক বা কন্ট্রাকচুয়াল' সংগঠনের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন নর্থ, ওয়েনগাস্ট, ওয়ালিস (২০০৯)।

৪৫. এই অনুভূত প্রয়োজনীয়তা মনে হয় ২০১৪-পরবর্তী প্রভুত্ববাদী দলীয় প্রেক্ষাপটে আরও শক্তিশালী হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন (হাসান ২০১৩; হোসেইন ২০১৭)।

৪৬. হ্যাবার ও অন্যান্য মিলে মেক্সিকোর প্রেক্ষাপটে ভিপিআইয়ের ধারণা তৈরি করেছেন এবং তা বিস্তৃত করেছেন।

৪৭. এ আলোচনার জন্য প্রথম অংশ দেখুন।

গ্রন্থপঞ্জি

—Ahmed, F., Greenleaf, A. and Sacks, A., "The Paradox of Export Growth in Areas of Weak Governance : The Case of the Ready Made Garment Sector in Bangladesh", in *World Development*, Volume, 56, 2014, Pages 258-271.

—Ahmed, S. (2014), "Searching for Sources of Growth in Bangladesh", paper presented at The First BEF Conference, Bangladesh Economists' Forum, Dhaka, 21-22 June, 2014.

—Ali, S. (2010), *Understanding Bangladesh*, London, C. Hurst & Co.

—Asadullah, N., Savoia, A. and Mahmud, W (2014), "Paths to Development : Is there a Bangladesh Surprise?" in *World Development*, Volume 62, October 2014, Pages 138–154.

—BGMEA, (2010), "Customs and Bond related Rules and Regulations for Export Oriented Ready–Made Garments (RMG) Industry", BGMEA, Dhaka.

—Biswas, N. (2016), 'The Limits of Reform : Elites, Politics and the Police in Contemporary Bangladesh', Unpublished Doctoral thesis, City, University of London.

—BIGD (2014), *The State of Governance Bangladesh 2013 : Democracy, party, politics,* BRAC Institute of Governance and Development, BRAC University, Dhaka.

—Blair, Harry. (2010), "Party Over institutionalisation, Contestation, and Democratic Degradation in Bangladesh," in Paul R. Bass, ed. *Handbook of South Asian Politics : India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal*. Routledge, London.

—CGS and BRAC RED. (2006), The State of Governance in Bangladesh, BRAC University.

—Coppedge, M. (1994) *Strong Parties and Lame Ducks*. Stanford, CA, USA : Stanford University Press.

—Davis, D. (2004), *Discipline and Development*, Cambridge University Press.

—Evans, P. (1995) *Embedded Autonomy*, University of California Press, Berkeley.

—Faruque, A. (2009), *Current Status and Evolution of Industrial Relations System in Bangladesh*, ILR School, Cornell University, USA.

—Geddes, B. *Politician's Dilemma*, University of California Press, Berkeley, 1994.

—Haber, S., Razo, A. and Maurer, N. (2003) *The Politics of Property Rights : Political Instability, Credible Commitments and Economic Growth in Mexico, 1876-1929*. Cambridge, UK : Cambridge University Press.

—Hassan, M. (2001), Demand for Second Generation Reform : The Case of Bangladesh, Ph.D Thesis, ICS, University of London

—Hassan, M. (2013), "Political settlement dynamics in a limited-access order : The case of Bangladesh," ESID Working Paper No. 23, University of Manchester.

—Hassan, M. and Pritchard, W. (2013), "The Political Economy of Tax Reform in Bangladesh : Political Settlements, Informal Institutions and the Negotiation of Reform," Working Paper, ICTD, IDS.

—Hassan, M. and Pritchard, W. (2013), "The Political Economy of Tax Reform in Bangladesh : Political Settlements, Informal Institutions and the Negotiation of Reform," Working Paper, ICTD, IDS.

—Hassan, M., Islam, M. and Zakaria, S. (2014), "Partyarchy and Political Underdevelopment" in *The State of Governance Bangladesh 2013 : Democracy, party, politics,* BRAC Institute of Governance and Development, BRAC University, Dhaka.

—Hassan, M. and Pritchard, W. (2016), "The Political Economy of Tax Reform in Bangladesh : Political Settlements, Informal Institutions and the Negotiation of Reform," *The Journal of Development Studies.*

—Hassan, M. and Nazneen, S. (2017), "Violence and Breakdown of the Political Settlement : An Uncertain Future for Bangladesh?" in *Conflict, Security and Development*, Routledge.

—Hossain, N., (2017), *The Aid Lab : Understanding Bangladesh's Unexpected Success*, Oxford University Press, UK.

—Islam, N. (1979) *Development Planning in Bangladesh : A Study in Political Economy*, Dhaka : UPL.

—Islam, N. (2013) *Making of a Nation*, Dhaka, UPL.

—Islam, M. and Siddique, M. (2010), "A Profile of Bank Loan Default In The Private Sector In Bangladesh," Dhaka, Muinul Islam, University Of Chittagong, Bangladesh.

—Jahan, R and Amundsen, I. (2012), "The Parliament of Bangladesh : Representation and Accountability," CPD-CMI Working Paper Series.

—Jayasuriya, K. (1999), *Law, Capitalism And Power In Asia*, Routledge.

—Kaßner, M. (2014),*The Influence of the Type of Dominant Party on Democracy*, Springer VS.

—Karim, S. (2005) *Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy*, Dhaka, UPL.

—Kabeer, N. and Mahmud, S. (2004) 'Globalisation, Gender and —Poverty : Bangladeshi Women Workers in Export and Local Markets', *Journal of International Development* 16.1: 93-109.

—Khan, M. (2013) "Bangladesh : Economic Growth in a Vulnerable Limited Access Order," in North, Douglass, John Wallis, Steven Webb and Barry Weingast (eds) *In the Shadow of Violence : The Problem of Development for Limited Access Order Societies.* Cambridge : Cambridge University Press 2013.

—Kochanek, S. (1993), *Patron-Client Politics and Business in Bangladesh*, UPL, Dhaka, 1993

—Kochanek, S. (2000), "The Growing Commercialization of Power" in R. Jahan (ed) *Bangladesh : Promise and Performance*, The University Press Limited, Dhaka.

—Kochanek, S. (2003), "The Informal political Process In Bangladesh," Report Prepared for the Department of International Development, U. K. High commission, Dhaka, Bangladesh.

—Labowitz, S. and Baumann-Pauly, D. (2015), "Beyond the Tip of the Iceberg : Bangladesh's Forgotten Apparel Workers," NYU

Stern Center for Business and Human Rights, New York.

—Levy, B. (2014), *Working With The Grain*, Oxford University Press.

—Majumdar, B. (ed) (2012), "Ninth National Parliament Election 2008 : Information on Participating Candidates," *Prothom Alo* and Shujan (in Bangla).

—Maniruzzaman, T. (1980) *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath*, Dhaka, Bangladesh Books International.

—Maniruzzaman, T. (1982) *Group Interests and Political Changes : Studies of Paistan and Bangladesh*, New Delhi, South Asian Publishers.

—Mainwaring, S. (1999) *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization*. Stanford, CA, USA : Stanford University Press.

—Monem, M. (2014), *The Politics Of Privatisation In Bangladesh*, Dhaka, OSDER.

—North, D, Wallis, J and Weingast, B. (2009), *Violence and Social Order*, Cambridge, Cambridge University Press.

—Olson, M. (1993). 'Dictatorship, Democracy and Development.' *American Political Science Review*, 87:3, 567-76.

—Rashid, M. (2008), 'Bad Governance and Good Success" in Nurul Islam and Asaduzzaman, M. (Eds) *A Ship Adrift : Governance and Development in Bangladesh*, BIDS, Dhaka.

—Roy, P. (2013), "India's Vulnerable Maturity : Experiences of Maharashtra and West Bengal" in North, Douglass, John Wallis, Steven Webb and Barry Weingast (eds) *In the Shadow of Violence : The Problem of Development for Limited Access Order Societies.* Cambridge : Cambridge University Press 2013.

—Roden, G. (2004), *Transparency and Authoritarian Rule in South East Asia*, Routledge Curzon.

—Saxena, S. (2014), *Made in Bangladesh, Cambodia, and Sri Lanka*, Cambria Press.

—Sen, K. and Tyce, M. 'The Politics of Structural Transformation : The Unravelling of Malaysia and Thailand's Deals Strategies', In *Deals and Development*, Eds : Lant Pritchett, Kunal Sen and Eric Werker Oxford, University Press, UK, 2018.

—Sobhan, R and Ahmad, M. (1980), *Public Enterprise in an Intermediate Regime : A Study in the Political Economy of Bangladesh*, Dhaka, BIDS.

—Sobhan, R. (1990), *From Aid Dependence To Self-Reliance*, Dhaka, BIDS.

—Sobhan, R. (Ed) [1991], *Debt Default to the Development Finance Institutions : The Crisis of State Sponsored Entrepreneurship in Bangladesh*, Dhaka, UPL.

—Sobhan, R. (1993), *Bangladesh : Problems of Governance*, Konark Publishers Private, Limited, New Delhi.

—Sobhan, R. (Ed) (2005), *Privatisation in Bangladesh*, Dhaka, UPL.

—Taslim, M. (2008), "Governance, Policies, and Economic Growth in Bangladesh" in Nurul Islam and Asaduzzaman, M. (Eds) *A Ship Adrift : Governance and Development in Bangladesh*, BIDS, Dhaka

—Transparency International Bangladesh (TIB) (2015), "Programs Taken To Establish Good Governance In The RMG Sector" (in Bengali).

—Ullah, M. (2016), *President Zia of Bangladesh : A Political Biography*, Dhaka, Adorn Books.

—Zazak, S. (2015), "Institutional layering and the emerging power of labour in Bangladesh," Paper prepared for the X Global Labour University Conference, 30 Sept. - 2 Oct. 2015, Washington D.C., U.S.

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন ও বৈষম্যের চালচিত্র

এম এম আকাশ

ভূমিকা

২০১৮ সালে বাংলাদেশ জন্মের পর ৪৭ বছর পূর্ণ হয়েছে। বলা যায়, সে এখন মানবজীবনের মতোই সমাজজীবনের মধ্যগগনে পদার্পণ করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, সে কি এখন স্থিতধী, প্রাপ্তবয়স্ক এবং উন্নত স্থিতিশীল একটি দেশে পরিণত হবে, নাকি পুনরায় তরুণ বয়সের ঝড়-ঝঞ্ঝা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হবে বা পেছন দিকে ফিরে যাবে? প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের মনে আজ এই প্রশ্নটিই উঁকি মারছে। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির একটি গ্রহণযোগ্য উত্তর দেওয়ার জন্যই আমি এই লেখায় যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

বাংলাদেশ এই ৪৭ বছরে অনেক ইতিবাচক উত্তরণ ঘটিয়েছে। আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে এই অর্জনগুলো কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু অনেকেই ন্যায়সংগতভাবে হয়তো বলবে, এর চেয়ে অনেক বেশি অর্জনের সম্ভাবনা ছিল বাংলাদেশের। বিশেষত, মুক্তিযুদ্ধের পরপর যেসব আকাশচুম্বী প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলাদেশ জন্মলাভ করেছিল, সে তুলনায় অর্জন যথেষ্ট হয়নি, বরং তা আংশিক খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ বলেই মনে হতে পারে।

উল্লিখিত বক্তব্য মেনে নিয়েও বলা যায়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য অনেক দেশের তুলনায় এই অর্জন সামান্য নয়। এসব অর্জন তাই বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্তে পরিণত করেছে। এসব আপেক্ষিক অর্জনের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়ে এই প্রবন্ধ শুরু করা যেতে পারে। অবশ্য দ্বান্দ্বিকতার সূত্র অনুযায়ী এ কথাও মনে রাখতে হবে যে এসব প্রতিটি অর্জনই মসৃণভাবে

মাখনের মধ্যে ছুরি চালানোর মতো অনায়াসে অর্জিত হয়নি। এই অর্জনের নায়কেরা এসব অর্জনের জন্য নীরবে-নিভৃতে তিলে তিলে কঠোর জীবনসংগ্রাম পরিচালনা করেছেন এবং এখনো করছেন। তাঁদের এই জীবনসংগ্রামকে আরও ফলপ্রসূ ও সফল করা—সেটাই ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ এবং সেটাই ঝুঁকি। এই ঝুঁকি মোকাবিলা করে জয়ী হতে না পারলে আমরা হয়তো পিছিয়ে আবার 'শুরুর যে শুরু' (Beginning of Beginning) যেখানে হয়েছিল, সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য হব। কিন্তু বাংলাদেশ একাত্তরের পেছনে কখনো যেতে পারে না, যাবে না, এই প্রত্যয় নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা শুরু করতে হবে। ইতিহাসে সাময়িক পশ্চাদপসরণের আশঙ্কা সর্বদাই উপস্থিত থাকে, কিন্তু তা নিশ্চয়ই আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাদেশের অর্জনসমূহ

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে যখন স্বাধীন হয়, তখন সে স্বাধীন হয়েছিল এক 'হিটলার বাহিনীকে' পরাজিত করে। সেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজয় ও আত্মসমর্পণের আগে গ্রহণ করেছিল এক 'পোড়ামাটি' নীতি। সেই নীতির অধীনে তারা নির্বিচার মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে-মেরে ছারখার করে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। সুতরাং বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন তার সারা গায়ে দগদগে ঘায়ের মতো অসংখ্য ক্ষতের চিহ্ন রয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সুযোগ্য সহচর তাজউদ্দীন আহমদকে তখন এই ক্ষত বা আঘাতগুলো সারিয়ে নেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব নিতে হয়। এই প্রাথমিক দায়িত্ব পরিপূরণে তাঁদের অর্জিত সাফল্যগুলো এখন অনেকে ভুলে গেছেন বা অনেকে এগুলোকে 'গ্রান্টেড' (granted) ধরে নিয়েছেন। তাই এগুলোকেও ঐতিহাসিক অর্জন হিসেবে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন আছে। কারণ, এগুলোই আমাদের স্বাধীনতার প্রাথমিক মৌলিক অর্জন এবং এগুলোকে সংহত না করে বা এগুলোর একটি ফয়সালা না করে আমাদের ইতিহাসকে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর করার কথাটা ভাবা নিতান্তই আহাম্মকি হবে অথবা কারও কারও ক্ষেত্রে হতে পারে তা একধরনের সচেতন ভণ্ডামি বা অবচেতনভাবে পাকিস্তান পন্থার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ।

স্বাধীনতার আশু অর্জনসমূহ

অনেক অর্জনের মধ্যে দুটি অর্জনকে আমি এখানে মৌলিক হিসেবে তুলে ধরছি—প্রথমত, ভারতীয় বাহিনী বা মিত্রবাহিনী আমাদের দেশ থেকে নিজের দেশে অচিরেই ফিরে গিয়েছিল। এর ফলে আমরা দুটি বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলাম। প্রথমত, এ দেশ স্বাধীন দেশ এবং আমরাই এ দেশের সার্বভৌম মালিক। দ্বিতীয়ত,

ভারত আমাদের দুঃসময়ের অকৃত্রিম বন্ধুও বটে। কারণ, যথাসময়ে ফিরে গিয়ে তারা আমাদের বন্ধুত্বের মর্যাদা মোটামুটি রক্ষা করল।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পরপর আমরা এক বিশাল পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলাম। কিন্তু অর্থনীতিতে বিতাড়িত পাকিস্তানি একচেটিয়া ধনিকদের বদলে বাঙালি একচেটিয়া ধনিকদের পুনর্বাসন তখন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সৈনিক শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের আর্থসামাজিক বৈষম্যবিরোধী উত্থান এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তিশালী অনুকূল উপস্থিতি তখন আমাদের শিল্প খাতে ব্যাপক জাতীয়করণের দিকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই ঠেলে দিয়েছিল। বিস্ময়করভাবে তখন প্রায় ৯৫ শতাংশ আধুনিক শিল্পসম্পদ-ব্যাংক-বিমা চলে আসে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে। রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ঘোষিত হয় 'সমাজতন্ত্র'। সাংবিধানিক নীতি হিসেবে 'সমাজতন্ত্র' গৃহীত হলেও বাস্তবে সবাই এই নীতির সমর্থক ছিলেন না। বিশেষত, আওয়ামী লীগ বা স্বাধীনতাসংগ্রামের মূল নেতৃত্বদানকারী দলের দক্ষিণপন্থী অংশ এই নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। খন্দকার মোশতাক ছিলেন সে উপদলের নেতা এবং বিক্ষুব্ধ বাঙালি পুঁজিপতিরা, পাকিস্তানের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী সাবেক আমলারা এবং অধিকাংশ পাকিস্তান প্রত্যাগত প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সেনাসদস্য, ইসলামি মৌলবাদে বিশ্বাসী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি, সবাই বোধগম্য কারণেই এই নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। কারও কারও কাছে এই নীতি ছিল তাঁদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির পথে অন্যায় প্রতিবন্ধক, আর কারও কারও কাছে তা ছিল ধর্মহীন নাস্তিকতার অনুসারী একটি মতবাদ এবং সর্বোপরি তখন একটি বিশেষ পত্রিকার পাতায় 'স্পষ্টভাষী' শিরোনামে এই প্রচারও চালানো হয়েছিল যে 'সমাজতন্ত্র' হচ্ছে 'ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রবৃত্তির বিরোধী', তাই এটি মূলগতভাবেই মানবচরিত্রবিরোধী এবং সে জন্যই এই কৃত্রিম মতবাদ শেষ পর্যন্ত টিকবে না, টিকতে পারে না। কিন্তু এসব প্রবল বহুমুখী বিরোধিতার মুখেও বাংলার জনগণের 'বৈষম্যবিরোধী-শোষণবিরোধী' তীব্র চেতনার প্রাবল্য তখন 'সমাজতন্ত্রকে' অন্তত অর্থনৈতিক আদর্শের রূপকল্প হিসেবে এবং সংবিধানের অন্যতম একটি মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়াকে অনিবার্য করে তোলে। তবে সমাজতন্ত্রের কায়েম কীভাবে হবে, কারা তা করবেন এবং সেটা কতখানি গণতান্ত্রিক হবে—এসব বিষয়ে তখন স্পষ্ট কোনো ধারণা জনগণের ছিল না। তবে পাকিস্তানি ২২ পরিবারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কারণে মানুষের মধ্যে সম্পদ ও আয়ের কেন্দ্রীভবনের বিরুদ্ধে এবং সমতা, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের পক্ষে একটি প্রবল আবেগ ছিল বলে মনে হয়। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সে সময় পরিপূরকরূপে আরও তিনটি মূলনীতি যোগ করা হয়: 'জাতীয়তাবাদ', 'গণতন্ত্র' ও

'ধর্মনিরপেক্ষতা'। ধরে নেওয়া হয় যে আমাদের দেশে আমরা সেই ধরনের 'সমাজতন্ত্র' কায়েম করব, যা চরিত্রের দিক থেকে 'গণতন্ত্র'বিরোধী হবে না, 'ধর্ম'বিরোধী হবে না, হবে না 'জাতীয়তাবাদ'বিরোধী। অর্থাৎ তখন ভাবাদর্শগত পরিমণ্ডলে প্রচলিত সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রচলিত যেসব অভিযোগ ছিল, সেগুলো বাদ দিয়ে একধরনের নিজস্ব দেশীয় মূল্যবোধ অনুসারে রচিত 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' একটি অস্পষ্ট চেতনা নিয়েই আমরা সেদিন সামনে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। বস্তুত, 'বিদ্যমান সমাজতন্ত্রকে' পরিপূর্ণভাবে বা মার্ক্সীয় ধারায় পরিপূর্ণ আদর্শ হিসেবে 'সমাজতন্ত্রকে' আমরা তখন গ্রহণ করিনি। বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের কতটুকু আমরা গ্রহণ করব, কতটুকু করব না, সেই বিতর্ক চলমান রেখেই তখন বঙ্গবন্ধুর সরকার সমাজতন্ত্রকে সাংবিধানিক অনুমোদন দিয়েছিল। সমাজতন্ত্রকে ঘিরে এই তরল ধারণা পরবর্তী সময়ে কখনো 'মুজিববাদ', কখনো 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' এবং কখনোবা 'বাকশাল' ইত্যাদি বিভিন্ন উপপ্রত্যয় বা উপচিন্তাধারার জন্ম দিয়েছিল। তবে আমার মতে, এর কেন্দ্রীয় সারসত্তারূপে 'বৈষম্য ও শোষণবিরোধী সমাজ'-এর ধারণাটি সর্বদাই এবং এখনো প্রবলভাবে জনমানসে সক্রিয় ছিল এবং আছে। আর এই উচ্চতর সক্রিয় সংগ্রামী চেতনার অর্জনটুকুই মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম একটি অর্জন বৈকি। যদিও তা ছিল পাকিস্তান আমলে পরিচালিত জনগণের ধারাবাহিক সংগ্রামেরই একটি ফসল, কিন্তু তা টেকসই হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের এই প্রগতিশীল নীতিগত অর্জনগুলোর মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলো অবশ্য পরবর্তী সময়ে ১৯৭২-৭৫ কালপর্বে ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই অর্জনগুলো সংহত হওয়ার বদলে কতগুলো নতুন তীব্র সংকটের সৃষ্টি হয়। প্রথম সংকট হচ্ছে অনিচ্ছুক রাষ্ট্রযন্ত্র ও মিশ্র একটি দলকে দিয়ে উচ্চতর আদর্শ সমাজতন্ত্র কায়েমের প্রচেষ্টা। সেখানে শাসক নেতৃত্বের সামনে 'বিষয়ীগত' নতুন যে শক্তি সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল, তা সৃষ্টি করতে নেতৃত্ব ব্যর্থ হন। ফলে ঘোষিত নীতি এবং তার বাস্তবায়নমাত্রার মধ্যে ক্রমাগত পার্থক্য সৃষ্টি হতে থাকে। মানুষ লক্ষ করে, মুক্তিযুদ্ধের উষালগ্নে যে 'বৈষম্য নিরসনের' জন্য 'সমাজতন্ত্রকে' নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হলো, সে বৈষম্য না কমে ক্রমেই তা বেড়েই চলেছে। উচ্চ মহলে নানা রকম দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লাইসেন্স, পারমিটবাজি ইত্যাদি অবাধে চলেছে, কোনো শাস্তি কাউকে দেওয়া হচ্ছে না, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ব্যবস্থাপনা ব্যর্থতা, ভুল নীতি গ্রহণ, ভুল ব্যক্তিকে ভুল দায়িত্ব প্রদান, সঠিক লোক ও প্রকৃত বন্ধুকে সঠিক দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া, এককথায় আজ আমরা যাকে 'সুশাসনের সমস্যা' হিসেবে অভিহিত করে থাকি, তার প্রবল বৃদ্ধি এবং উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্র তখন নিত্যনতুন সংকট সৃষ্টি করতে থাকে। তখন আমাদের সম্পদ ছিল খুবই অপ্রতুল এবং আমাদের পরনির্ভরতা ছিল অনেক

বেশি। এই সংকটের ভিড়ে তরুণসমাজের দেশ গড়ার ইতিবাচক চেতনাটি আস্তে আস্তে থমকে দাঁড়িয়ে যায় এবং পিছু হটতে থাকে। দলে দলে মুক্তিযোদ্ধারা তখন বিভক্ত হয়ে, হতাশ হয়ে নীরব হয়ে যান অথবা বিক্ষুব্ধ হয়ে নেতিবাচক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর তখনই বাংলাদেশের অনিবার্য ট্র্যাজেডি—১৯৭৫ সালের প্রতিবিপ্লবটি সংঘটিত হয়। এই ব্যর্থতার জন্য মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগকেই আজ প্রগতিশীল বামপন্থীরা প্রধানত দায়ী বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিণতির একাধিক দৃষ্টান্তও তো রয়েছে। ভিয়েতনাম, চীন ও কিউবার দৃষ্টান্তগুলো থেকে সঠিক শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের বামপন্থীরা কেন বাংলাদেশে সেদিন অগ্রসর হলেন না বা হতে পারলেন না, সেই পাল্টা প্রশ্নটিও জাতীয়তাবাদীরা তুলতে পারেন।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর মূলনীতি ও কর্মসূচিগুলো জনগণের মানস বা বিষয়ীগত সামাজিক চেতনার চেয়ে বেশি সামনে এগিয়ে গিয়েছিল কি? আমরা যে কাজ হাতে নিয়েছিলাম, প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান বাস্তব শর্তগুলো কি তার উপযুক্ত ছিল না, নাকি আমাদের মধ্যে কিছু বিষয়ীগত ভ্রান্তির কারণেই আমরা ব্যর্থ হয়েছি। বিশেষত, আজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সমাজতন্ত্রের প্রকল্পটি কিছুটা ব্যর্থ এবং কিছুটা সংস্কারের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার কারণে এ প্রশ্নটি এখন নতুন করে আবার উচ্চারিত হচ্ছে। সৎ জাতীয়তাবাদীদের ছুড়ে দেওয়া এসব প্রশ্নের একটি যথাযথ উত্তর বামপন্থীদের খুঁজে বের করতে হবে। আমার জানামতে, এভাবে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে দ্বান্দ্বিকভাবে দেখে বাংলাদেশের তদানীন্তন 'বাম মহলের' তদানীন্তন সীমাবদ্ধতাটি চিহ্নিত করার একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন বাংলাদেশের তদানীন্তন অন্যতম আলোকিত বাম চিন্তাবিদ অধ্যাপক আনিসুর রহমান। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি গ্রন্থে [*যে আগুন জ্বলেছিল: মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ*] তিনি এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত লিখেছেন। এই বইটি তরুণদের জন্য একটি অবশ্যপাঠ্য বই হতে পারে। আমি সেই বই থেকে নিচের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিটি তুলে ধরছি:

> 'মার্ক্সীয় বইয়ের পাতায় উৎপাদন সম্পদের মালিকানার সঙ্গে উৎপাদন শক্তির সংঘাতে সমাজ পরিবর্তন হবে এই তত্ত্ব দেওয়া ছিল এবং সেই অনুযায়ী বাম মহলের মনে এই ধারণা বোধ হয় বদ্ধমূল হয়েছিল যে সমাজ পরিবর্তনের প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে মালিকানার পুনর্বণ্টন করা। কিন্তু এ দেশে দীর্ঘকালের স্বাধিকার সংগ্রাম ও সর্বশেষে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এমন একটা বস্তুগত ও চেতনাগত অবস্থা এনে দিয়েছিল, যে অবস্থায় তখনই আইনগত মালিকানা স্পর্শ না করেও যৌথ সৃষ্টিশীলতাধর্মী ও অন্যান্য প্রগতিশীল মূল্যবোধধর্মী উদ্যোগের জন্য অনুকূল সময় এসে গিয়েছিল। এমনকি যেসব জায়গায় এ রকম উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল, সেসব স্থানে বিত্তবানেরাও এসব উদ্যোগে শরিক হয়েছিল, কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কেউ সামাজিক

> চেতনার চাপে আর মধ্যবিত্ত শ্রেণির অগণিত নর-নারী এ সমস্ত উদ্যোগে বিশেষ অনুপ্রেরণায় সক্রিয়, অনেক ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিয়েছিল—এই সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। সবশেষে, এ রকম উদ্যোগের ফসল সব ক্ষেত্রে চিরাচরিত হারে উৎপাদন সম্পদের মালিকদের ঘরে উঠে যাচ্ছিল না।...এ রকম কাজের প্রত্যয়গত ও ব্যবস্থাপনাগত মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে দেশের সমস্ত প্রগতিশীল মহল যদি ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাহলে সমাজে এ রকম মূল্যবোধের রোমান্টিক স্বপ্নের সঙ্গে নয়, সক্রিয় শক্তির সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হতো, এভাবে এ রকম একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তকে কবজা করে সমাজে একটি নতুন আরও সম্ভাবনাময় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে সমাজকে সমাজ বিপ্লবের জানা ছকের বাইরে হলেও একটি নতুন "উন্নত" পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করার মতো সৃষ্টিশীল চিন্তা আমাদের প্রতিষ্ঠিত প্রগতিশীল মহল করতে পারেনি।' [আনিসুর রহমান, ১৯৯৭, পৃ. ৬]

অধ্যাপক আনিসুর রহমানের বামদের এই সমালোচনাটির অনেক পাল্টা সমালোচনাও রয়েছে। ওই পর্যায়ে এ ধরনের যৌথ ইতিবাচক উদ্যোগগুলো কোনো সামষ্টিক শক্তি তৈরি করতে সক্ষম হতো কি না, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এগুলো বুদ্‌বুদের মতো আবির্ভূত ও নির্বাপিত হতো বলেই অনেকে মনে করেন। তাই তাঁদের মতে, 'শ্রেণিসংগ্রাম ত্বরান্বিত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' সম্পন্ন করার তদানীন্তন সরাসরি বাম লাইনটিই ছিল সঠিক এবং সব বাম মিলে জাসদসহ সেই লাইনটি গ্রহণ করলে সেটাই পারত স্বাধীনতার অর্জনগুলো সংহত করে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে, এ রকম একটি মত তখন মাঠে বেশ প্রবল ছিল। তবে এখন অবশ্য আমরা দেখছি যে তারা নিজেদের এই মত পরিত্যাগ করে আরেক বিপরীত চরম মেরুতে অবস্থান গ্রহণ করেছে। যদিও সেই সময় তাঁদের মতে, মুজিববিরোধী বাম ঐক্যই ছিল তখনকার জন্য সঠিক রণকৌশল। এখন তা বদলে স্বরগ্রাম তাঁরা অনেক নিচে নামিয়ে এনেছেন। মস্কোপন্থী বাম হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের বৃহত্তম বামপন্থী ধারাটি তখন ওই সরকার উৎখাতের কৌশল প্রত্যাখ্যান করে মুজিব সরকার বা পেটিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তি সম্পর্কে 'ঐক্য ও সংগ্রামের' দ্বান্দ্বিক কৌশল গ্রহণ করেছিল। ইউরোপের বা আমেরিকার উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে যেখানে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণি সংখ্যায় যথেষ্ট বড়, অগ্রসর ও শক্তিশালী এবং অন্য পশ্চাৎপদ শোষিত শ্রেণিগুলোকে নিজের নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম, সেখানে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বটির বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতা বেশি। অনুন্নত দেশে যেখানে সংগঠিত খাতে শ্রমিকের সংখ্যা অসংগঠিত খাতের শ্রমিকের তুলনায় নগণ্য, সেখানে এ ধরনের শ্রমিকশ্রেণিভিত্তিক বিপ্লবের সম্ভাবনা কম বা বিপ্লব করে ক্ষমতা দখল করলেও সেখানে পশ্চাদপসরণ বা আপস যে করতে হয়, তার প্রচুর উদাহরণ ইতিহাসে রয়েছে। কিউবা, চীন, ভিয়েতনাম, নেপাল—সর্বত্রই তা এত দিন পরে আবার

দেখা যাচ্ছে। তাই মূলত বহু শ্রেণিভিত্তিক কোয়ালিশনের মাধ্যমেই জাতীয় গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নীতি নিয়েই উন্নয়নশীল দেশে বামপন্থীরা এযাবৎ অগ্রসর হয়ে আসছেন। যদিও এই কোয়ালিশনে নেতৃত্ব কারা দেবেন, এ নিয়ে বামপন্থীদের মধ্যে সূক্ষ্ম মতপার্থক্য রয়েছে। যাঁরা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধতাপন্থী বাম, তাঁরা ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগ্রামের গণভিত্তি প্রসারিত করার চেয়ে নিজস্ব নেতৃত্বের পূর্বশর্তটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। আর যাঁরা 'কাদা না মাখলে কাদা' পরিষ্কার করা যায় না অথবা নেতৃত্ব যৌক্তিক একটি বিষয় বা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শক্তি ভারসাম্য বদল করে নেতৃত্ব অর্জন করে নিতে হয়, এই কৌশলে বিশ্বাস করেন, তাঁরা অবশ্য বিশুদ্ধ, সংকীর্ণ ও 'ঝাঁজালো' সংগ্রামের বদলে ধৈর্যশীল বহু শ্রেণিভিত্তিক বহুমুখী কাজেই নিজেদের নিয়োজিত করেছেন বেশি। তার ফলে এ দেশে তাঁরা গণশক্তিরূপে বিকশিত ও সম্প্রসারিতও হয়েছেন বেশি, তবে তাঁরাও আনিসুর রহমানের পরামর্শকৃত ইতিবাচক কাজগুলোকে শেষ বিচারে সংস্কারবাদী বা শাসক দলের লেজুড়বৃত্তিমূলক কাজ বলেই অভিহিত করেছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তাই এই কাজগুলো তাঁদের কাছে শ্রেণিভিত্তিক লড়াই বা রাজনৈতিক লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন একধরনের সংস্কারবাদী বিচ্যুতি বা 'এনজিও-মার্কা' কাজ হিসেবেই গণ্য হয়েছে। কিন্তু গভীরভাবে ভেবে দেখলে এ কথা স্পষ্ট হবে যে সংস্কার বা পরিমাণগত পরিবর্তনের কাজের সঙ্গে বিপ্লব বা মৌলিক পরিবর্তনের সম্পর্কটি পরস্পর পরিপূরক। বিপ্লব শুধু ধ্বংস নয়, তার অপর পিঠেই আছে সৃষ্টি ও সৃষ্টির জটিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। বস্তুত, ইতিবাচক সংস্কারমূলক কাজগুলো যদি সচেতনভাবে মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, তাহলে তা আসলে মৌলিক পরিবর্তনেরই একধরনের প্রস্তুতিমূলক পর্ব। বিপ্লবকে ফলপ্রসূ ও সামাজিকভাবে সম্মতির ভিত্তিতে রক্ষা করতে হয়। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সম্মতির ভিত্তিতে বিপ্লবকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এই সম্মতি আদায়ের সামাজিক কৃৎকৌশলটি জানা ও প্রয়োগ করার সক্ষমতা অর্জন আগেই করা সম্ভব হলে তা করাই দরকার। ভবিষ্যতের জন্য তা ফেলে রাখলে সেটা হবে একধরনের অবিমৃশ্যকারিতা। তখন আমরা জয়ী হয়ে আবার পরাজিত হব—যেমন এখন হচ্ছি!

ওই একই গ্রন্থে আনিসুর রহমান বর্তমান অধিকতর প্রতিকূল বিশ্বপরিস্থিতিতে আমাদের মতো দেশে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নেতিবাচক সংগ্রামের পাশাপাশি নানা রকম যৌথ ইতিবাচক অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীল কাজের বাস্তব প্রয়োজনকে সামনে তুলে ধরে যে নির্মম সত্য কথাটি বলেছেন, তা এখন আরও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায়,

> বিশ্বে আজ আনুষ্ঠানিক বাম দর্শন পরাজিত এবং মানুষের ব্যক্তিসত্তার চেতনা একটি

স্থায়ী চেতনা বলেই এ পর্যন্ত ইতিহাস রায় দিয়েছে। তবে ব্যক্তিসত্তার চেতনায় শিকড় গেড়েও মানুষে মানুষে পারস্পরিক সহযোগিতার সংস্কৃতিও মানব ইতিহাসে একটি চিরন্তন সত্য। এই সহযোগিতা বিভিন্ন বাস্তব প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে, ব্যক্তি উদ্যোগ আর যৌথ উদ্যোগের মধ্যে ভারসাম্য বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিত হয়েছে। এ দেশের জনসম্পদের সঙ্গে পার্থিব সম্পদের বিশেষ অনুপাতের জন্য দেশের অগ্রযাত্রায় ব্যক্তিস্বার্থকে প্রধান চালকের আসনে বসালে অঙ্ক মেলে না (এই বিপুল জনশক্তিকে প্রধানত ব্যক্তিস্বার্থের লালসায় সৃষ্টিশীল কাজে নিয়োজিত করবার জন্য অর্থাৎ প্রত্যেককে আলাদাভাবে তার ব্যক্তিলালসা চরিতার্থ করবার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ দিতে চাইলে তার জন্য যথেষ্ট সম্পদ নেই)—এ কথা আমি অনেকবার বলেছি। হয়তো ইনটুইটিভভাবে হলেও এই সত্যটি বুঝে এ দেশের জনগণও স্বাধীনতার প্রত্যুষে যৌথ উদ্যোগের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল ও দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং এ রকম উদ্যোগে বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছিল সমাজের শিক্ষিত ও ছাত্র সম্প্রদায়, যখন তারা গতানুগতিক সামাজিক মর্যাদা জ্ঞান ভুলে তাদের পাশে তাদের সঙ্গে দৈহিক পরিশ্রম করতে নেমে গিয়েছিল। আমরা আমাদের জনগণের ইনটুইটিভ অঙ্ক জ্ঞানের উপরে আস্থা না রেখে বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ প্রমুখ বিদেশি মাস্টার রেখে তাদের পরামর্শে জনবল আর পার্থিব সম্পদের অঙ্কটা মেলাবার চেষ্টা করে করে দেশটাকে ব্যক্তিস্বার্থের বর্বরতম প্রতিভূ সন্ত্রাসীদের হাতেই তুলে দিয়েছি, যাদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করতে আজকে মুক্তিযুদ্ধের বীর বিক্রমরাও সফল হবেন বলে খুব ভরসা করা যাচ্ছে না। স্বাধীনতার পরে যে লগ্নটি এসেছিল, সে লগ্নটি হারিয়ে গেছে। এ দেশের মানুষের সৃষ্টিশীলতা চরিতার্থ করবার সংগ্রাম আজ অনেক বেশি কঠিন হয়ে গেছে। দেশে আর্থসামাজিক বৈষম্য আজকে পর্বতাকার ধারণ করেছে এবং তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভোগের প্রদর্শনী, তা দুর্নীতি বা সন্ত্রাসলব্ধ অর্থে হলেও, সৃষ্টিশীলতার প্রদর্শনীর চেয়ে বেশি মর্যাদা পাচ্ছে। এমনকি দেশের বুদ্ধিজীবী মহলেও আমাদের বিদেশি মাস্টারের শেখানো বুলিই বেশি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তবু দেশের নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সেই সময়কার মতো মূল্যবোধ নিয়ে (আত্মনির্ভরতা, আত্মশক্তি, যৌথ শ্রম, শিক্ষা ও জ্ঞান এবং সর্বোপরি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক সমাজের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি মূল্যবোধ—লেখক) সৃষ্টিশীল উদ্যোগ চলে এসেছে ও আজও চলছে। [আনিসুর রহমান, ১৯৯৭, পৃ. ৭]

স্বাধীনতার উষালগ্নের অর্জনগুলোর বিপুল সম্ভাবনা, বিপুল ব্যর্থতা এবং কঠোর শিক্ষাসংক্রান্ত আলোচনাটি আরও দীর্ঘ করা যেত কিন্তু তাতে সাম্প্রতিক বাংলাদেশের অর্জন ও সীমাবদ্ধতাসংক্রান্ত অ্যাজেন্ডাগুলো কিছুটা উপেক্ষিত হতে পারে বলে এখানেই এই আলোচনার ইতি টানছি। তবে ইতিহাস ও অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই ভবিষ্যতের পথ রচনা করতে হয়, এ কথা ভুলে গেলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি রোধ করা যায় না।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্জন ও তার চালিকা শক্তিসমূহ

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্জনের জন্য সবাই বাংলাদেশকে আজ বাহবা দিচ্ছে। বাংলাদেশকে এখন মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ পশ্চিমা দেশগুলো উদীয়মান অর্থনীতির

দেশ নামে অভিহিত করছেন। এশিয়ার নতুন বাঘ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার। এর কী লক্ষণ? লক্ষণ হচ্ছে, আমাদের তৈরি পোশাকশিল্প এখন বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে চলে গেছে। লক্ষণ কী? লক্ষণ হচ্ছে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। লক্ষণ কী? লক্ষণ হচ্ছে কৃষি খাতে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ কেবল স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি, চাল রপ্তানির কথাও ভাবতে পারছে। লক্ষণ হচ্ছে, কৃষিমজুরি ভরা মৌসুমে দিনে ৪০০ টাকায় পৌঁছেছে আর চাহিদা যখন কম থাকে, অর্থাৎ হালকা মৌসুমে ২০০ টাকা কমে কোনো স্থানেই কাউকে নিয়োগ দেওয়া যায় না। মোটা চালের দাম ৫০ টাকা ধরলেও গড় মজুরি ৩০০ টাকা দিয়ে অন্তত ৬ কেজি চাল কেনা যায়। এ প্রসঙ্গে আশির দশকের একটি জনপ্রিয় দাবির কথা স্মরণ করতে পারি। সে সময়ে ক্ষেতমজুর সমিতি দিনে সাড়ে চার কেজি চাল কেনা যায়, এমন হারে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সম্ভাবনার বাংলাদেশের আরও লক্ষণ হচ্ছে—নিয়মিতই রাস্তায় দেখি যে রিকশাচালক নিজের রিকশায় আয়েশি ভঙ্গিতে বসে মোবাইল ফোনে কথা বলছে। লক্ষণ হচ্ছে, বাংলাদেশের স্কুলগুলোতে চার কোটি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে, যাদের প্রত্যেকের হাতে বছরের প্রথম দিনেই নতুন এক সেট পাঠ্যবই তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। অমর্ত্য সেনের মতো নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন সময়ে তাঁর বক্তৃতায় স্বীকার করছেন যে কতিপয় সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ভারতের চেয়েও এগিয়ে রয়েছে। আমাদের দেশে চরম দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে (১০-১২ শতাংশ)। মঙ্গা অনেকাংশে দূর হয়েছে। উপজেলা কেন্দ্রগুলোতে অকৃষি খাতে নানা ধরনের ছোটখাটো উদ্যোগ গড়ে উঠেছে। তাদের এখন আমরা পোশাকি নাম দিয়েছি 'SME'। গ্রামের ও শহরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক বেড়েছে। আমরা অর্থনীতিবিদেরা এ ধরনের সামগ্রিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলি—বিমানটি এখন আর ঘর্ঘর শব্দ করে ইঞ্জিনে শক্তি সঞ্চয় করবে না, সোজা উড়ে যাবে (টেক-অফ)।

এই বক্তব্যকে বিস্তৃত পরিসংখ্যান দিয়ে সমর্থনের প্রয়োজন নেই। কারও যদি এ বিষয়ে মনে সন্দেহ থাকে, তাহলে তিনি এম নিয়াজ আবদুল্লাহ (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়), অ্যান্টনিও স্যাভয়য়া (ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ওয়াহিদ উদ্দিন মাহ্‌মুদ (ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ, বাংলাদেশ) লিখিত, 'Path to Development : Is there a Bangladesh surprise?' প্রবন্ধটি পাঠ করতে পারেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত *World Developement*, vol-62, pp.138-154, 2014 জার্নালে।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে, নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশের এই ব্যতিক্রমী উন্নয়নের পেছনে শক্তিগুলো কী ছিল?

প্রথম চালিকা শক্তি হচ্ছে কৃষি ও কৃষকসমাজ। তারা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে, নতুন ধরনের ফসল বিন্যাসের মাধ্যমে এবং বিশেষভাবে দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা অর্থের বিনিময়ে জমি ভাড়া নিয়ে বাংলাদেশে একরপ্রতি কৃষি উৎপাদন কয়েক গুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে গ্রামাঞ্চলে খাদ্যের অভাব কমে এসেছে। শহরাঞ্চলে খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল থেকেছে। অথবা বাড়লেও একদম ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়নি। খাদ্য আমদানির জন্য বড় অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয়নি। সরকারের রিজার্ভ অক্ষুণ্ন থেকেছে। শহরে খাদ্যমূল্য কমবেশি স্থিতিশীল থাকার কারণে শিল্পশ্রমিকদের আর্থিক মজুরি বৃদ্ধির তাগিদ তীব্রভাবে অনুভূত হয়নি। তবে এভাবে অনেক দিন সস্তা মজুরি বজায় থাকার কারণে পোশাক শিল্পপতি ও রপ্তানিকারকদের প্রচুর মুনাফা হয়েছে। অন্যদিকে কৃষির এই বিকাশের ফলে গ্রামাঞ্চলেও অভ্যন্তরীণ বাজার প্রসারিত হয়েছে। কৃষকসমাজ তাদের বর্ধিত আয়ের ফলে যেসব স্থানীয় অকৃষিজ পণ্য ক্রয় করেছে, তার ফলে অকৃষি খাতও গ্রামাঞ্চলে বিকাশ লাভ করেছে। এই হচ্ছে কৃষি ও কৃষকের সংক্ষিপ্ত উন্নয়নমুখী চালচিত্র। কৃষির এই সামগ্রিক অগ্রগতির পেছনে মেহনতি কৃষকের ভূমিকাই মুখ্য। তবে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কৃষি সহায়ক নীতিমালাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

আমাদের উন্নয়নের দ্বিতীয় চালিকা শক্তি হচ্ছে পোশাকশিল্প। পোশাকশিল্পের মূলে রয়েছে 'সস্তা নারী শ্রমিকদের' অবদান। এটি সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশে নারীদের বর্ধিত হারে শ্রমবাজারে প্রবেশের ফলে। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় বাধা বা সামন্তবাদী-পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি কোনো অলঙ্ঘনীয় বাধায় পরিণত হতে পারেনি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উচ্চ মজুরির কারণে অনেক দেশ প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে শ্রমঘন পণ্য উৎপাদন বাদ দিয়ে পুঁজিঘন পণ্য উৎপাদনে 'শিফট' করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের শ্রমঘন রপ্তানি শিল্পের পণ্যের জন্য বিশ্ববাজারে কোনো সমস্যা তৈরি হয়নি। তারা অনায়াসে অন্যের শূন্যস্থান পূরণ করে করে এগিয়ে গেছে। শুধু উন্নত দেশে নয়, মধ্য উন্নত দেশগুলোতেও বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের বাজার বর্তমানে কিছুটা প্রসারিত হচ্ছে (২০১৬-১৭ বছরে বাংলাদেশ উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ চীনে প্রায় ৩৯২ মিলিয়ন ডলারের তথা ৩১০০ কোটি টাকার পোশাক রপ্তানি করেছে!)।

অন্যদিকে কিছু শিক্ষিত আধুনিক উদ্যোক্তা এই শিল্পে যোগ দেওয়ায় এখানে আধুনিকায়ন এবং ক্রমে ক্রমে উচ্চতর মানসম্পন্ন ব্র্যান্ড আইটেম তৈরি করে উচ্চতর পর্যায়ে অগ্রগমনের সুযোগও শিল্পে তৈরি হয়েছে। এককথায় এই প্রথমবারের মতো একটি 'জাতীয় বুর্জোয়া' শ্রেণির অবয়ব নিয়ে এ দেশে মাঝারি সম্পদের অধিকারী উদ্যোক্তাগোষ্ঠীর আবির্ভাব হতে শুরু করেছে। এরা বৃহৎ

বুর্জোয়া নয়। এরা অধিকাংশই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্তর থেকে আসা। তাঁদের অনেকেরই বামপন্থী ও দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক অতীতও রয়েছে। তাঁদের অনেকেই নিছক লুটপাট করে বা রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহ করেননি। তাঁরা মূলত বিশ্বায়নসৃষ্ট সুযোগ ও বিদ্যমান সস্তা শ্রমকে ব্যবহার করে 'উৎপাদন-মুনাফার্জন-বিনিয়োগ-বর্ধিত পুনরুৎপাদন' এই কায়দায় নিজেদের ধনসম্পদ ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলেছেন। তবে ধন উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এঁদের কেউ কেউ 'ব্যবস্থাপনার' কঠিন দায়িত্বটি বিদেশি ম্যানেজারদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে শুরু করেছেন। অতিধনী কেউ কেউ কিছু পুঁজি বিদেশেও পাচার করছেন। সেখানে গড়ে তুলছেন ওই দেশের তুলনায়ও অত্যাধুনিক বিলাসবহুল সেকেন্ড হোম বা দ্বিতীয় নিবাস। এটা অবশ্য তাঁরা একা নন, অসৎ ও সন্ত্রস্ত রাজনীতিবিদ, আমলা ও পলায়নবাদী হতাশ সাধারণ নাগরিকেরাও এতে জড়িত। এসব নেতিবাচক কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা এবং এই ধরনের শ্রমঘন রপ্তানি খাতে পুঁজিবাদী শোষণের হার তীব্র হলেও এটা নিকৃষ্ট অনুৎপাদনশীল 'ব্যবসা-আমলা পুঁজি' নয় বা নিছক 'কমিশনভোগী পুঁজি' নয়। এর একটি কর্মসৃষ্টি ও উৎপাদনমুখী ভূমিকা রয়েছে যদিও অনেক কারখানাতেই শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে লাভের খুবই অসম ও অন্যায় বণ্টন অব্যাহত রয়েছে। তাই এই শিল্পের বিপুল সম্ভাবনার বাস্তবায়ন অনেকখানি নির্ভর করবে যুগপৎ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষম বণ্টনের ওপর।

বাংলাদেশে আমরা তৃতীয় যে চালিকা শক্তির কথা শুনতে পাই, তা হচ্ছে আমাদের নতুন প্রাপ্তি 'Demographic Dividend' ও তার ফলাফল হিসেবে প্রবাসী শ্রমিকসহ তরুণ শ্রমবাহিনীর উদ্ভব ও অবদানের কথা। বর্তমানে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আমরা ১ শতাংশের কাছাকাছি নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের পরিবারগুলোতে তরুণ কর্মক্ষম নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের মধ্যে যাঁদের সামর্থ্য আছে, তাঁরা বিদ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত রয়েছেন। যাঁরা শ্রমের উপযুক্ত এবং বিদ্যাশিক্ষায় অপারগ, তাঁরা নানাভাবে বিদেশে পাড়ি দিয়ে অথবা গ্রামীণ অকৃষি খাতে (যেমন: নির্মাণশিল্প, পরিবহন খাত, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মোবাইল সার্ভিসসহ অন্যান্য সেবা খাত ইত্যাদি) কর্মনিয়োজনের ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন।

পরিবারের নারীরাও যে এগিয়ে এসেছেন, তা আমি আগেই বলেছি। এসবের ফলে বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারে নির্ভরশীল জনসংখ্যার বোঝা কমে এসেছে। এখন আয় করছেন পরিবারের একাধিক সদস্য, কখনো কখনো তিনজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গড়ে দেড় জন। ফলে কোথাও কোথাও স্বামী-স্ত্রীর জীবনে টানাপোড়েন বা অন্য ধরনের আধুনিক জীবনের জটিলতা তৈরি হলেও

পরিবারের আর্থিক দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে দ্রুততর হারে। উপরন্তু লাভ হচ্ছে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। বৈদেশিক মুদ্রার মজুত শক্তিশালী হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমানে অতীতের মতো বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের হুমকি-ধমকি আর কার্যকর হচ্ছে না। সম্প্রসারণশীল সরকারি ব্যয়, কৃষিতে উচ্চ ঋণপ্রবাহ ও ভর্তুকি প্রদান, পাটশিল্প রক্ষার উদ্যোগ, বহুমুখী পদ্মা সেতু প্রকল্প ইত্যাদি ইতিবাচক জাতীয় স্বার্থানুকূল নীতিমালা বৈদেশিক প্রতিকূল চাপ সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের আমলে অব্যাহত রয়েছে। যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু কিছু অসংগতি বিদ্যমান রয়েছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের চতুর্থ চালিকা শক্তি হচ্ছে এসএমই, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহ। গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষক এবং শহরাঞ্চলে সচ্ছল ব্যক্তি খাতের সদস্যরা এসব নানা ধরনের উৎপাদনশীল উদ্যোগে নিয়োজিত হয়েছেন। এসব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অনানুষ্ঠানিক চরিত্রের কারণে এখানে নিয়মকানুনের বালাই অপেক্ষাকৃত কম। ঋণ, গ্যাস, বিদ্যুৎ, মাস্তানি, চাঁদাবাজি, হরতাল, ধর্মঘট, উচ্চ সুদের হার ইত্যাদি বিভিন্ন বাধার মধ্যেও তাঁদের অদম্য অগ্রগতি লক্ষণীয়। তাঁরাই বাংলাদেশে গরিবের ভোগের জন্য, গরিবের শ্রম দ্বারা এবং গরিবের ক্ষুদ্রায়তন পণ্য অর্থনীতি টিকিয়ে রেখেছেন। ঠিকমতো পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তাঁরাও জাতীয় বুর্জোয়া হিসেবে আনুষ্ঠানিক শিল্প খাতে যোগ দিয়ে নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হবেন। তবে এ জন্য দরকার হবে বিদ্যুৎ ও অবকাঠামোগত সেবার পাশাপাশি সস্তা ঋণ ও সুশাসন। এগুলো থাকলে বিদেশি বাজারের দিকেও তাঁরা নিজেদের প্রসারিত করতে পারবেন।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে এতক্ষণ আমি যে চারটি ইতিবাচক উন্নয়ন উপাদানের বর্ণনা উল্লেখ করলাম, সেগুলোর সম্মিলিত এক বিপুল সম্ভাবনা নানা নেতিবাচক ও প্রতিকূল বাধার কারণে বর্তমানে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে পারছে না। প্রশ্ন উঠেছে, এ ধরনের উন্নয়ন সফল হলে কি আর্থসামাজিক বৈষম্য দূর হবে? উত্তর হচ্ছে, হতেও পারে, না-ও হতে পারে। ব্যক্তিমালিকানাধীন বাজার অর্থনীতিতে বৈষম্য থাকবেই। কিন্তু সেখানে যদি একচেটিয়া শিল্প-ব্যাংকমালিক গড়ে ওঠে, রাষ্ট্রক্ষমতায় যদি অসৎ আমলা + ব্যবসায়ী + রাজনীতিবিদের নেক্সাস বা বন্ধন তৈরি হয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্র যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে যে বৈষম্য তৈরি হবে, তা হবে চরম বৈষম্য এবং অনৈতিক বৈষম্য, যার ভিত্তি হচ্ছে অনুপার্জিত আয়ের কেন্দ্রীভবন।

সে রকম চরম বৈষম্য তৈরি হবে কি হবে না, তা নির্ভর করবে কয়েকটি বিষয়ের ওপর—প্রথমত, বাজার অর্থনীতি ধাক্কায় যারা তলিয়ে যেতে বসেছে, এ রকম হতদরিদ্রজন, সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সুবিধাবঞ্চিত জনগণ ইত্যাদি

সুনির্বাচিত গোষ্ঠীর জন্য একটি উপযুক্ত ত্রুটিমুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারছে কি পারছে না তার ওপর; দ্বিতীয়ত, ভূসম্পদ, পুঁজি বা ঋণ এবং মানবপুঁজির (অর্থাৎ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা) বণ্টনে সমতা (ইকুয়ালিটি অর্থে নয়, ইক্যুইটি অর্থে) রক্ষিত হলো কি হলো না; তৃতীয়ত, আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সবার জন্য প্রতিযোগিতার সমসুযোগ নিশ্চিত করা গেল কি গেল না; চতুর্থত, ক্রমাগত জাতীয় সীমানার ভেতরে বাজার প্রসারিত করা সম্ভব হচ্ছে কি না, বাইরের আন্তর্জাতিক বাজারেও শক্তি ভারসাম্য নিজের অনুকূলে নিয়ে আসা গেল কি গেল না; পঞ্চমত, শ্রমঘন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগগুলো দ্রুত গ্রহণ করার ওপর। উন্নয়নের এই মডেলটি ঠিক পুঁজিবাদী মডেলও নয়, আবার সমাজতান্ত্রিক মডেলও নয়। কেউ কেউ একে 'মিশ্র অর্থনীতির মডেল' বা 'উত্তরণশীল অর্থনীতির' মডেল নামে অভিহিত করেছেন। এই মডেলের পরিণতি বা লক্ষ্য হচ্ছে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমতা নিশ্চিত করা।

আশার কথা হচ্ছে, মধ্যপন্থীরা এবং এমনকি সম্মিলিতভাবে জাতিসংঘের সাম্প্রতিক প্রস্তাবিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কর্মসূচিতেও' স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে নতুন সহস্রাব্দে উন্নয়নের লক্ষ্য হতে হবে 'বৈষম্য হ্রাস', অর্থাৎ সমাজের নিম্নতম ৪০ শতাংশের আয় উচ্চতর ৬০ শতাংশের চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পেতে হবে! এমনকি এই লক্ষ্য বর্তমানে বিশ্বব্যাংকও মেনে নিয়েছে। কারণ, আজ এটা প্রমাণিত সত্য যে কেউ যদি শুধু দারিদ্র্যই দূর করতে চায়, তাহলেও উচ্চ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, তাহলে শুধু উচ্চ প্রবৃদ্ধি দিয়ে যেটুকু দারিদ্র্য দূর হতো, তার চেয়ে অনেক বেশি হারে দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব হবে (বিশ্বব্যাংক, ২০১৬)।

সমাজের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের চিত্র ও শ্রমজীবী নিম্নবিত্তদের অবস্থা

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অতীত এবং সাম্প্রতিক উজ্জ্বল অর্জনগুলোর যে বিবরণ ওপরে তুলে ধরা হলো, তার সবচেয়ে বিপজ্জনক ও নেতিবাচক দিকটি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদবৈষম্য। বাংলাদেশের আয়বৈষম্য সাম্প্রতিক কালে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৮ সালে পরিমিত আয়বৈষম্যের জিনি সূচক দশমিক ৩৮ থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে দশমিক ৪৮-এ পরিণত হয়েছে। নিচের ১ নম্বর তালিকায় জিনি সূচকের ধারাবাহিক গতিপ্রবণতা তুলে ধরা হলো।

১ নম্বর তালিকা অনুসারে, ১৯৮৮-৮৯ সাল থেকে শুরু করে ২০০৫ পর্যন্ত জাতীয় আয়বৈষম্যের জিনি সূচক ছেদহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ২০০৫-১০ কালপর্বে তালিকা থেকে দেখা যায় যে জাতীয় জিনি সূচকটি সামান্য হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু আমরা যদি আলাদাভাবে গ্রাম ও শহরে বৈষম্যের মাত্রা ও

গতিপ্রবণতার দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে দেখতে পাব এই আয়বৈষম্য গ্রামে সব সময়ই তুলনামূলকভাবে শহরের তুলনায় কম ছিল। আর শহরে শেষ পাঁচ বছর (২০০৫-১০) আয়বৈষম্য হ্রাস পেলেও গ্রামে তা হ্রাস পায়নি। অর্থাৎ গ্রামে আয়বৈষম্য সর্বদাই ছিল ঊর্ধ্বমুখী। আসলে গ্রামে ও শহরে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্যই হচ্ছে বাংলাদেশের সাধারণ চিত্র। শহরে শেষের দিকে যে সামান্য বৈষম্য হ্রাসের তথ্য পাওয়া যায়, তা গবেষকদের কাছে এখনো প্রশ্নবিদ্ধ রয়েছে। তবে সবচেয়ে উদ্বেগজনক হচ্ছে ২০১৬ সালের সর্বশেষ হিসাবটি। *ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস* পত্রিকার ২০১৮ সালের ২ এপ্রিল প্রকাশিত আসজাদুল কিবরিয়ার রিপোর্ট অনুসারে বৈষম্যেও সূচক সর্বকালের সর্বোচ্চে পরিণত হয়েছে ০.৪৮৩।

তালিকা-১ : আয়বৈষম্যের জিনি সূচকের মান

সাল	মোট	গ্রাম	শহর
১৯৮৮-৮৯	.৩৭৯	.৩৬৮	.৩৮১
১৯৯১-৯২	.৩৮৮	.৩৬৪	.৩৯৮
২০০০	.৪৫১	.৩৯৩	.৪৯৭
২০০৫	.৪৬৭	.৪২৮	.৪৯৭
২০১০	.৪৫৮	.৪৩০	.৪৫২
২০১৬	.৪৮০	-	-

উৎস : রুশিদান ইসলাম, ২০১২, পৃ. ১৮৫, আসজাদুল কিবরিয়া, ২০১৮

প্রকৃত চিত্রটি ফুটিয়ে তোলার জন্য এবং সাধারণ লোকের বোঝার সুবিধার জন্য আমরা আয়বৈষম্যকে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। সর্বোচ্চ ১০ শতাংশের আয়, সর্বনিম্ন ৪০ শতাংশের আয়ের কত গুণ বেশি, সেই হিসাবটাও আমরা আয়বৈষম্যের সূচক হিসেবে নিতে পারি। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'পালমা অনুপাত' (Palma Ratio)। এই অপেক্ষাকৃত বোধগম্য অনুপাতটিই এখন পণ্ডিতমহলে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সম্প্রতি প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি ব্যাকগ্রাউন্ড পেপারে এই সূচকেরও পরিমাপ তুলে ধরা হয়েছে। নিচের তালিকায় পালমা অনুপাতের ধারাবাহিক গতিপ্রবণতা তুলে ধরা হলো।

তালিকা-২ অনুসারে, ১৯৮০-২০১০ কালপর্বে বাংলাদেশে আয়বৈষম্য বা সর্বোচ্চ ১০ শতাংশের আয়ের সঙ্গে সর্বনিম্ন ৪০ শতাংশের আয়ের ফারাক ক্রমাগত

অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পালমা অনুপাতটি ১৯৮০-এর দশকে ছিল ১.৬৬। অর্থাৎ তখন সর্বোচ্চ ১০ শতাংশের আয় শেয়ার সর্বনিম্ন ৪০ শতাংশের আয় শেয়ারের তুলনায় ১.৬৬ গুণ বেশি ছিল। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে পালমা অনুপাত ২.০৮-এ পরিণত হয় এবং ২০০০ সালের পরবর্তী ১০ বছরে তা আরও বেড়ে ২.৫৬-তে পরিণত হয়েছে। সুতরাং পালমা অনুপাতটি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে গরিবের কাছে যাচ্ছে মোট জাতীয় আয়ের স্বল্প থেকে স্বল্পতর অংশ এবং ধনীদের কাছে যাচ্ছে মোট জাতীয় আয়ের অধিক থেকে অধিকতর অংশ। তালিকায় তাই দেখানো হয়েছে ৮০-এর দশকে দেশের ৪০ শতাংশ নিম্ন আয়ের অধিকারীরা যে জায়গায় মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ১৮.২২ শতাংশ ভোগ করতেন, সে জায়গায় এখন তাঁরা ভোগ করছেন আরও কম। অর্থাৎ মাত্র ১৪.৩৪ শতাংশ। পক্ষান্তরে দেশের ধনী ১০ শতাংশ মানুষ ৮০-এর দশকে ভোগ করতেন মোট জাতীয় আয়ের ৩০.২৫ শতাংশ। কিন্তু এখন ২০০০ সালের পরবর্তী দশকে তাঁরা ভোগ করছেন প্রায় ৩৬.৭৫ শতাংশ।

তালিকা-২ : 'আয়ের শতাংশ' বিশ্লেষণ : পালমা অনুপাত

আয়ের শতাংশ (%)	১৯৮০-এর দশক	১৯৯০-এর দশক	২০০০-এর দশক
সর্বনিম্ন ৪০ শতাংশ	১৮.২২	১৬.৩০	১৪.৩৪
মধ্যবিত্ত ৫০ শতাংশ	৫১.৫৩	৪৯.৭২	৪৮.৯২
সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ	৩০.২৫	৩৩.৯৭	৩৬.৭৫
পালমা অনুপাত	১.৬৬	২.০৮	২.৫৬

উৎস : এস আর ওসমানী (২০১৫), পৃ. ১৫

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই পালমা অনুপাত বৃদ্ধি কি ন্যায়সংগত? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে আমাদের দেশে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার এবং প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হারের গতিপ্রবণতা। যদি দেখা যায় যে আমাদের দেশে শ্রমের উৎপাদনশীলতা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে তুলনায় প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার কম হয়েছে, তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারব যে শ্রমজীবীরা তাঁদের আনুপাতিক ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা বর্ধিত উৎপাদন বা প্রবৃদ্ধির যথাযথ 'শেয়ার' পাননি। সে অবস্থায় অসম প্রবৃদ্ধির এই চরিত্র স্বাভাবিকভাবেই ক্রমাগত বেশি বেশি করে বৈষম্যের জন্ম দিতে বাধ্য। সৌভাগ্যের বিষয়, এস আর ওসমানীর পেপারে সেই

তথ্যগুলোও পাওয়া যায় এবং পালমা অনুপাত বৃদ্ধির পেছনে এই অসম প্রবৃদ্ধির অবদানও তিনি হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর পেপার থেকে তাঁর ব্যাখ্যার সমর্থনে নিম্নোক্ত দুটি তালিকা এখানে তুলে ধরা হলো (তালিকা-৩ এবং তালিকা-৪ দ্র.)।

তালিকা-৩ : জিডিপি প্রবৃদ্ধির বিন্যাসের বিশ্লেষণ (Decomposition), কর্মনিয়োজন বৃদ্ধির হার এবং উৎপানশীলতা বৃদ্ধির হার (শতাংশ)

	১৯৮১-১৯৮৯	১৯৮৯-২০০০	২০০০-২০১০
বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধির হার	৩.৪২	৪.৯০	৬.৫০
বার্ষিক কর্মনিয়োগ বৃদ্ধির হার	৩.১৭	২.৫৬	৩.৩২
বার্ষিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার	০.২৫	২.৩৪	৩.১৮
জিডিপি বৃদ্ধিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অবদান	৭.৩০	৪৭.৮	৪৮.৯০

উৎস : এস আর ওসমানী (২০১৫), পৃ. ১৬

তালিকা-৩ থেকে আমরা দেখতে পাই যে আশির দশকে আমাদের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে খুবই নিম্নহারে। সে সময় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল কর্মনিয়োজন বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশ নিচে। কিন্তু নব্বইয়ের দশক এবং ২০০০ সালের পর থেকে আমাদের প্রবৃদ্ধির হার অনেক বেড়েছে, কিন্তু সে তুলনায় কর্মসংস্থান অত বেশি হারে বাড়েনি। ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা এ সময়টাতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

এবার ৪ নম্বর তালিকার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক :

তালিকা-৪ : প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার

	নামিক মজুরি	খাদ্যদ্রব্যের দাম সূচক	প্রকৃত মজুরি	শ্রমিকপিছু জিডিপি
১৯৮১-১৯৮৯	১২.৪৩	৯.৫২	২.৯১	০.২৫
১৯৮৯-২০০০	৫.৪৪	৫.৩১	০.১৩	২.৩৪
২০০০-২০১০	৮.৯৪	৮.১৭	০.৭৭	৩.১৮

উৎস : এস আর ওসমানী (২০১৫), পৃ. ১৭

উপরিউক্ত তালিকা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে বিস্ময়করভাবে ১৯৮১-৮৯ কালপর্বে শ্রমিকপ্রতি জিডিপি কম হারে বাড়লেও (মাত্র দশমিক ২৫ শতাংশ বার্ষিক হার), প্রকৃত মজুরি বেড়েছে অনেক বেশি হারে (প্রায় ২.৯১ শতাংশ বার্ষিক হার)। সম্ভবত এই সময় গণতন্ত্রের সংগ্রাম এবং শ্রমিকশ্রেণির তীব্র লড়াইয়ের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু পরবর্তী দুই দশকে দেখা যাচ্ছে, শ্রমিকপিছু জিডিপি বৃদ্ধির হার অনেক বেশি হলেও (২.৩৪ শতাংশ এবং ৩.১৮ শতাংশ), প্রকৃত মজুরি এই সময় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে মাত্র শূন্য দশমিক ১৩ শতাংশ এবং শূন্য দশমিক ৭৭ শতাংশ হারে। এই চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে দেশের সামগ্রিক অবস্থা যে হারে উন্নত হয়েছে এবং তাতে শ্রমিকেরা বর্ধিত হারে ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও সমানুপাতে আয়ের বৃদ্ধি ঘটাতে পারেননি।

বাংলাদেশের এ ধরনের প্রবৃদ্ধি এবং বিদ্যমান আয়বৈষম্য আমাদের জাতিকে বিভক্ত করে ফেলছে। আমরা যদি দেখতে পাই যে আমি একজন দরিদ্র ব্যক্তি এবং আমার ছেলের শিক্ষা হবে মাদ্রাসায় এবং আমার প্রতিবেশী একজন ধনী ব্যক্তি, তাঁর ছেলে পড়বে উচ্চ বেতনের উচ্চ মানের ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়ে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমার কাছে 'শিক্ষা' হবে একটি মহার্ঘ পণ্য—এটি আর কোনো সামাজিক অধিকারের বিষয় থাকবে না। যেহেতু দরিদ্র ব্যক্তিরা বস্তুগত সম্পদের অধিকারী নন, সেহেতু শিক্ষাসম্পদ থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হলে তাঁদের ভবিষ্যৎ বিকাশের পথও রুদ্ধ হয়ে যাবে। ফলে সেসব পরিবারে হতাশা অনিবার্য হয়ে উঠবে, সামজে অসন্তোষ ও অস্থিতিশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। অনুরূপভাবে আমার কোনো ব্যাধি হলে আমি দরিদ্র বলে সরকারের হাসপাতালের বারান্দায় পড়ে থাকব এবং যিনি ধনী, তিনি সিঙ্গাপুরে সর্দির জন্য চিকিৎসা নিতে যাবেন, তাহলেও কিন্তু সমাজে বঞ্চনাবোধ কমবে না। সুতরাং যত দিন সরকারি নীতি সামাজিক সেবাকে বাণিজ্যিক ধারায় পরিচালিত করবে, তত দিন হতাশা ও ক্ষোভ অব্যাহত থাকবে এবং নাগরিকদের মধ্যে আত্মশক্তি সমতার চেতনা এবং জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে উঠবে না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে সর্বজনীন অধিকারে পরিণত না করে উন্নয়নশীল দেশগুলো বৈষম্যকে কখনো হ্রাস করতে পারেনি। আমাদের দেশেও পারবে না। পূর্ব এশিয়ার টাইগার হিসেবে পরিচিত দেশগুলো থেকে যদি কোনো শিক্ষা নিতে হয়, তাহলে এই শিক্ষাটিই হবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে আমার অর্ধেক শরীর চুল্লিতে এবং অর্ধেক শরীর 'হিমাগারে' থাকলেও গড়ে আমি তথাকথিত নাতিশীতোষ্ণ থাকব ঠিকই কিন্তু কেউই তা পছন্দ করবেন না। একইভাবে তাই বাংলাদেশে গড় প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে আমরা অনেক গর্ব করলেও তা অতটা উচ্ছ্বাস তৈরি করছে না। তাই এই

উচ্চ প্রবৃদ্ধির মধ্যেও একবার ভেবে দেখুন দরিদ্রের বিশেষ বিশেষ পকেটগুলোর কথা, গোষ্ঠীগুলোর কথা। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী, হাওরের দরিদ্র অঞ্চল, চর এলাকা, উপকূলীয় এলাকা, দলিত গোষ্ঠী, কর্মহীন ভূমিহীন গোষ্ঠী, শহরের বস্তিবাসী, ভবঘুরে কর্মহীন লুম্পেন গোষ্ঠী, নারীপ্রধান খানাসমূহ, নানা ধরনের প্রতিবন্ধী জনগণ ইত্যাদি চরম দরিদ্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানবেতর জীবনযাপনকারী বিশাল এই জনসংখ্যার কথাও আমাদের বিশেষভাবে ভাবতে হবে। এদের আমরা এমনকি সঞ্চিত শ্রম বাহিনী (Reserve Army of labour) বা সুপ্ত কর্মক্ষম ব্যক্তি হিসেবেও গণ্য করতে পারছি না। এদের আমরা সমাজের বাইরে হতদরিদ্র হিসেবে অপাঙ্‌ক্তেয় অঞ্চল ও গোষ্ঠীতে পরিণত করেছি। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির কথা সব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লেখা হলেও এই গোষ্ঠীগুলো সর্বদাই প্রবৃদ্ধির ও কর্মসংস্থানের মূলধারার অর্থনীতির আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে। তারা অনেকটাই সরকারি-বেসরকারি দয়াদাক্ষিণ্য অথবা যখন যতটুকু তখন ততটুকু এভাবেই কোনো আশা ছাড়াই বেঁচে রয়েছে। জীবন-মৃত্যুর প্রান্তসীমায় এদের আশাহীন, আলোহীন অন্ধকার জীবন দিনের পর দিন পার হয়ে যাচ্ছে। এরা বর্তমানে অসংগঠিত খাতেরও তলানি। এদের সম্ভাব্য সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি। এদের শ্রমদানে সক্ষম ও উজ্জীবিত করে তোলাও হচ্ছে আমাদের আরেকটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। এই লুম্পেনদের উৎপাদনশীল ধারায় ফিরিয়ে আনতে না পারলে আমাদের রাজনীতিও পরিশ্রুত হবে না। সম্প্রতি এদের জন্য যে ৯০টি সামাজিক নিরাপত্তা জালের কর্মসূচি সরকার হাতে নিয়েছে, তা সংখ্যায় অনেক হলেও বরাদ্দের ওজনে নিতান্তই অপ্রতুল এবং দুর্নীতি ও 'লিকেজে' আকীর্ণ। এমনকি এসব মানুষের কোনো সুনির্দিষ্ট তালিকা এখন পর্যন্ত সরকার তৈরি করতে পারেনি। অথচ বছরের পর বছর এদের জন্য সরকারি অর্থ ব্যয় হচ্ছে, যার এক-তৃতীয়াংশ 'লিক' হয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। একদিকে অপচয়, অন্যদিকে গালভরা বুলি ও কর্মসূচির ছড়াছড়ি, এটাই সাধারণ চিত্র। আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়, এসব কর্মসূচি মূলত গ্রামেই বিস্তৃত, শহরে এদের কোনো চিহ্ন নেই। যেন শহরে কোনো হতদরিদ্র লোক নেই!

বাংলাদেশে শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত শ্রেণির সাধারণ অবস্থার সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র

বাংলাদেশ সরকার এই ভেবে গর্ববোধ করে যে দেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এই দারিদ্র্যের হার আসলে নির্ভর করবে দারিদ্র্য আয়রেখার মানের ওপর। একসময় দৈনিক ১ ডলার আয়ের নিচে যাঁরা আয় করতেন, তাঁদের দরিদ্র ধরা হতো। এখন সারা বিশ্বে দৈনিক ১ দশমিক ২৫ বা ২ ডলারের নিচে

যাঁরা আয় করেন, তাঁদের দরিদ্র বলে ধরা হচ্ছে। সেই হিসাবে যদি চারজনের একটি পরিবার ধরে নিই এবং তাদের প্রাপ্তবয়স্ক লোকসংখ্যা তিনজন ধরে নিই, তাহলে ওই রকম একটি পরিবারের জীবনমান তথাকথিত দারিদ্র্য আয়রেখার ঊর্ধ্বে রাখতে হলে তাঁদের প্রতি মাসে কমপক্ষে (১.২৫ x ৩ x ৩০) = ১১২.৫০ ডলার বা ৯ হাজার (১ ডলার = ৮০.০০) টাকা উপার্জন করতে হবে। আর উচ্চতর ২ ডলারকে ভিত্তি ধরলে এর পরিমাণ দাঁড়াবে মাসিক ১৪ হাজার ৪০০ টাকা। তবে এই হিসাবটা ন্যূনতম খাওয়া খরচ মাত্র। কিন্তু বর্তমানে শহরে ও গ্রামের অনানুষ্ঠানিক খাতে কয়টি পরিবার আজ সেই উপার্জন করতে পারছে? গ্রামাঞ্চলে কৃষিমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ার পরও মাসে সব দিন কাজ থাকলে এবং গড়ে প্রতিদিন ৩০০ টাকা মজুরি উপার্জন করলে ওই মজুর পরিবারটির মাসিক আয় ৯ হাজার টাকার বেশি হবে না। তবে স্ত্রীও শ্রমিক হিসেবে কাজ করলে দুজনে মিলে হয়তো তাঁরা দারিদ্র্য আয়রেখার প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু একটি সামান্য ধাক্কা, চালের দামের একটি শক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আবার তাঁদের ঠেলে যেকোনো সময় নিচে নামিয়ে দিতে পারে। সুতরাং তাঁদের জীবন এ অবস্থায় প্রান্তিক ও অনিশ্চিতই থেকে যাচ্ছে।

তবে যেসব গ্রামীণ শ্রমজীবী বিদেশে পাড়ি দিতে পারছেন, অকৃষি খাতে বাড়তি আয়ের সুযোগ পাচ্ছেন বা নিম্ন আয় অঞ্চল থেকে উচ্চ আয়ের অঞ্চলে পাড়ি জমাতে পারছেন, তাঁদের ভাগ্যে কিছুটা হলেও ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা জুটছে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নগণ্য এবং তাঁদের সঙ্গে নিচের তলানি দরিদ্রদের বৈষম্যও আবার বেড়ে চলেছে। এ জন্য এখন আমরা দরিদ্রদের প্রসঙ্গে দুটো শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করি—দরিদ্র এবং হতদরিদ্র।

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে বা সংগঠিত খাতের শ্রমিকদের অবস্থাটি কী রকম? বর্তমানে ২০১৪ সালের প্রস্তাবিত বেতন স্কেলে সর্বনিম্ন পিয়নের মূল বেতন ধরা হয়েছে ৮ হাজার ২৫০ টাকা। তার সঙ্গে বিভিন্ন ভাতা যোগ করলে এই পরিমাণটা দাঁড়াবে ১৩ হাজার ২০০ টাকা। সুতরাং এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, এত উন্নতির পরও আমাদের সরকারি চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা দৈনিক ২ ডলারের কম আয় নিয়ে দারিদ্র্যসীমাতেই হাবুডুবু খাচ্ছেন। অথচ এই বেতন স্কেলেই যিনি সর্বোচ্চ বেতন পাবেন, তাঁর মূল বেতন ধরা হয়েছে ৭৫ হাজার টাকা এবং সব মিলিয়ে তাঁর বেতন হবে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বেতনের অনুপাত দাঁড়াচ্ছে ১ : ১০। অথচ স্বাধীনতার উষালগ্নে বাংলাদেশের প্রথম অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রস্তাব করেছিলেন যে এই অনুপাতটি হওয়া উচিত ১ : ৫। শুধু এখানেই শেষ নয়। বেতন স্কেলের বাইরে সুপার স্কেল তৈরি করে বর্তমানে সিভিল-মিলিটারি প্রশাসনে বিশেষ সুবিধাভোগী-মর্যাদাভোগী গোষ্ঠী

তৈরিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে বর্তমান প্রস্তাবিত বেতন স্কেলে। বেতনবহির্ভূত সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও তৈরি হয়েছে নানা বৈষম্য।

বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য কোনো শ্রম আইন নেই, নেই কোনো ন্যূনতম মজুরিবিধি ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার। অথচ বাংলাদেশের ৫ কোটি ৬৭ লাখ শ্রমশক্তির মধ্যে ৪ কোটি ৭৩ লাখই কাজ করেন অনানুষ্ঠানিক খাতে; অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রায় ৮৩ শতাংশ নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী সব ধরনের অধিকার ও আইনি সুযোগের বাইরে অবস্থান করছেন। যে ১৭ শতাংশ শ্রমিক সংগঠিত খাতে কাজ করেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রম নিয়োগকারী শিল্পটি হচ্ছে পোশাকশিল্প। তাতে বর্তমানে ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করছেন এবং তাঁদের অধিকাংশই হচ্ছেন নারী শ্রমিক। তাঁদের বর্তমান ন্যূনতম মজুরি হচ্ছে ৫ হাজার ৩০০ টাকা মাত্র; অর্থাৎ দারিদ্র্য আয়ের প্রায় অর্ধেকের সমান। বাংলাদেশের এই মজুরি মান পোশাক খাতে পৃথিবীতে সর্বনিম্ন এবং বাংলাদেশের এই শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারও বর্তমান শ্রম আইনে নতুন করে নানাভাবে খর্ব করা হয়েছে। ফলে এখানেও চাপা অসন্তোষ জমা হচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের সংগঠিত খাতের শ্রমিকশ্রেণিও অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় অনেক নিম্নতর আয় ও সুবিধা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। দারিদ্র্যরেখার আয়ের আশপাশেই তাদের অবস্থান। তাদের সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধাও নিতান্তই অপ্রতুল বা গুণে-মানে ভয়ংকরভাবে নিম্নস্তরের। উপরন্তু শ্রমজীবীদের মধ্যেও আনুষ্ঠানিক খাত ও অনানুষ্ঠানিক খাত, গ্রাম এবং শহর, নারী এবং পুরুষ, প্রত্যন্ত বিচ্ছিন্ন অঞ্চল এবং সক্রিয় যোগাযোগসম্পন্ন অঞ্চল ইত্যাদি অবস্থাভেদে রয়েছে নানা বৈষম্য। আর ২ কোটি অনিয়মিত আধা শ্রমজীবী, অর্ধবেকার লোক জীবন চালাচ্ছেন হতদরিদ্র গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে। তাঁদের মধ্যে একদিকে তৈরি হচ্ছে পরমুখাপেক্ষিতা, দাননির্ভরতা আর অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে অপরাধ ও ভাড়া খাটার লুম্পেন প্রবণতা।

সুতরাং এককথায় বলা যায় যে বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনের জন্য 'বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল স্ট্র্যাটেজি' থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মুক্তবাজার ও চুইয়ে পড়া প্রবৃদ্ধির তত্ত্ব থেকে বের হয়ে আসতে হবে এবং 'সমতাপূর্ণ প্রবৃদ্ধির' নীতি গ্রহণ করতে হবে; অর্থাৎ প্রবৃদ্ধিকে এমন চরিত্রের হতে হবে, যাতে আগামী দিনগুলোতে ধনীদের আয় যে হারে বৃদ্ধি পাবে, তার চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পাবে দরিদ্রদের আয়। বর্তমান সরকার সম্প্রতি আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) দলিলে অনুস্বাক্ষর দিয়েছে, তাতেও এই লক্ষ্যের কথা বলা আছে। কিন্তু এই নতুন ধরনের অর্জনের জন্য চাই নতুন ধরনের ক্ষমতা বিন্যাস, নতুন ধরনের শ্রেণি কোয়ালিশন এবং নতুন ধরনের রাজনীতি।

পরিশিষ্ট-১

বিশ্বের 'বৈষম্য' ও বাংলাদেশ

বিশ্বের 'বৈষম্য' নিয়ে এখন অনেক উদারপন্থী ও অসমাজতন্ত্রী উদ্বিগ্ন। নব্বইয়ের দশকে 'সমাজতন্ত্র নির্মাণের পরাজয়' নিয়ে যে প্রাথমিক আনন্দোচ্ছ্বাস (Euphoria) অসমাজতন্ত্রীদের মধ্যে ছিল (যেমন বহুল উচ্চারিত ফুকুইয়ামার, উক্তি 'End of History'!), এখন তা দ্রুতই অপস্রিয়মাণ। আমাদের দেশেও আমরা দেখতে পাই নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসও বলতে বাধ্য হয়েছেন,

> The present version of capitalism will never deliver equitable distribution of income. A system that is built as a sucking machine cannot bring equitable distribution. It was never put in its DNA. In todays world 85 individuals own more wealth than all those in the bottom half. Top half population of the world own 99 percent of the wealth of the world, leaving only 1.0 percent for the bottom half. It may get worse because technology will remain under the control of the people at the top. (*Financial Express*/*Daily Star*, Dhaka, 18-19, November, 2014)

পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে বিশ্বের নেতারা একত্র হয়ে যেসব বক্তব্য দিয়েছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ :

> Unemployment and rising income inequality will be top concerns for global leaders in 2015, said a study of World Economic Forum (WEF). The organization, which each year gathers the global elite in the Phish Swiss ski resort of Davos, has drawn up list of the top 10 issues likely to preoccupy leaders over the coming 12-18 months. Rising income inequality tops the list, which based on survey of 1800 experts, including former US vice president Al Gore and former British Prime Minister Gordon Brown.

জাতিসংঘের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল বান কি মুনও 'বিশ্ব সামাজিক ন্যায়বিচার দিবসের' (World Day of Social Justice) এক বাণীতে বলেছেন,

> ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বিশ্বে দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে খাটো বা লঘু (undermine) করে দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিভাজনরেখাগুলো (fault lines) খুবই স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। সেগুলো হচ্ছে : নারী ও যুবকদের জন্য কম মজুরি এবং শিক্ষার, স্বাস্থ্যের ও ভদ্র কাজের (Decent Job) ক্ষেত্রে সুযোগের তারতম্য। আমাদের এমন নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে, এমন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও শক্তিশালী করতে হবে, যাতে

'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের' ধারাটি আরও এগিয়ে যায়।

(World Day of Social Justice, 20-02-2018)

সম্প্রতি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকও তাদের এক রিপোর্টে স্বীকার করে নিয়েছে যে 'বৈষম্য' এশিয়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে। 'Inclusion, Resilence, Change : ADB's Strategy 2020 at Mid term' শীর্ষক (২০১৪ সালে প্রকাশিত) এক রিপোর্টে লেখা হয়েছে,

> এশীয় অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, প্রচলিত উন্নয়ন ধারার বিপুল পরিবেশবিধ্বংসী পরিব্যয়, জলবায়ু সংকটের বিপদ ইত্যাদি বিষয় বর্তমানে প্রধান উদীয়মান ইস্যু হিসেবে ওপরে উঠে এসেছে—এই আলোকেই এশিয়ার জন্য নতুন উন্নয়ন পথের নকশা প্রণীত হচ্ছে...এই অঞ্চলের ১২টি দেশ যেখানে সারা পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৮০ শতাংশ বাস করে, সেখানে আয়বৈষম্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে; যার ফলে দারিদ্র্য হ্রাসের ওপর প্রবৃদ্ধির প্রভাব দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং সামাজিক সংহতি হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।
>
> (এডিবি, তারিখ : ৫-৩-২০১৪)

অনেকে এ প্রসঙ্গে চীনের অভিজ্ঞতা টেনে এনে বলেন যে চীন তো বৈষম্য বাড়িয়েই উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জাতিসংঘের সিনিয়র গবেষক নজরুল ইসলাম তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত *Economies In Transition : China, Russia and Vietnam* গ্রন্থে একটি চিত্রনকশার মাধ্যমে কীভাবে চীনের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য চীনে 'মধ্য আয়ের ফাঁদ' তৈরি করছে, তা তুলে ধরেছেন। এখানে উল্লেখ্য, 'মধ্য আয়ের ফাঁদ' ধারণাটি বাংলাদেশের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ, আমরাও যদি এখনই 'অর্থনৈতিক বৈষম্য' কমানোর উদ্যোগ না নিই, তাহলে চীনের মতো ওই ফাঁদে আমরাও আটকে থাকতে বাধ্য হব। উন্নত আয়ের দেশ হওয়া আর আমাদের কপালে জুটবে না। এই বিপজ্জনক আশঙ্কাটি বোঝার জন্য নিচের যৌক্তিক চিত্রটি দেখুন :

চিত্র : মধ্য আয়ের ফাঁদ চীনে কীভাবে তৈরি হচ্ছে?

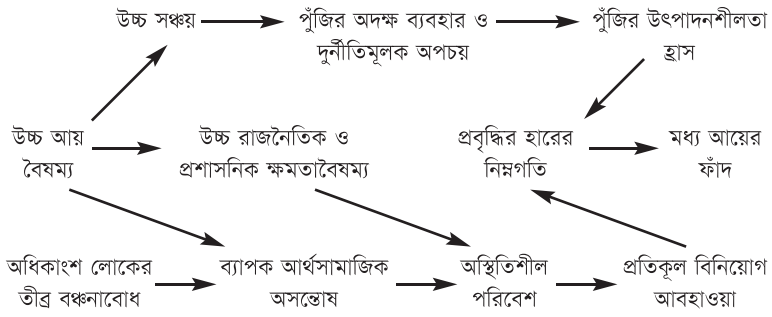

২০১৩ সালে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের একটি রিপোর্টে বিশ্বের ৮১টি দেশের বৈষম্যমাত্রার চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছিল। নিচের তালিকায় সেটি তুলে ধরা হলো এবং তালিকার সর্বশেষ সারিতে বাংলাদেশের সর্বশেষ প্রাক্কলিত বিদ্যমান বৈষম্যমাত্রাও তুলে ধরা হলো। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বেও গড়হারের তুলনায় তা অনেক বেশি।

অঞ্চল	গড় জিনি সূচক		দেশের সংখ্যা
	২০০৮	২০১৩	
সাব-সাহারান অঞ্চল	৪৪.১	৪৩.৮	(৯)
দক্ষিণ এশিয়া	৩৬.৭	৩৬.২	(৩)
মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা	৩৫.৩	৩৩.৪	(২)
লাতিন আমেরিকা	৪৯.৭	৪৮.০	(১৭)
পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া	৩১.৯	৩১.৪	(২৩)
পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয়	৩৯.২	৩৭.৩	(৭)
উন্নত শিল্পায়িত দেশ	৩২.০	৩১.৮	(২০)
সারা বিশ	৩৭.৯	৩৭.১	(৮১)
বাংলাদেশ	.৪৬ (২০১০)	.৪৮	(২০১৬)

উৎস : বিশ্বব্যাংক (২০১৬) এবং আসজাদুল কিবরিয়া (২০১৮)

গ্রন্থপঞ্জি

১। আনিসুর রহমান (১৯৭১), (সম্পাদক), *যে আগুন জ্বলেছিল : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ*, গণপ্রকাশনী, গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র, সাভার।

২। এম নিয়াজ আবদুল্লাহ্, *পাথ টু ডেভেলপমেন্ট : ইজ দেয়ার আ বাংলাদেশ সারপ্রাইজ*, ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট, ভলিউম : ৬২, পৃ. ১৩৮-১৫৪, ২০১৪।

৩। এস আর ওসমানী (২০১৫), *লিংকিং ইক্যুইটি অ্যান্ড গ্রোথ ইন বাংলাদেশ*, বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তৈরি করা ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার (অপ্রকাশিত), প্ল্যানিং কমিশন, ঢাকা।

৪। জোসেফ ই স্টিগলিটজ (২০১৩), *দ্য প্রাইস অব ইনইকুয়ালিটি*, পেঙ্গুইন পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক, ইউএসএ।

৫। রুশিদান ইসলাম, (২০১২), *বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন : স্বাধীনতার পর ৪০ বছর*,

সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

৬। বিশ্বব্যাংক (২০১৬), *পভার্টি অ্যান্ড শেয়ারড প্রসপারিটি : টেকিং অন ইনইকুয়ালিটি-২০১৬*, ওয়াশিংটন, ইউএসএ।

৭। আসজাদুল কিবরিয়া (২০১৮), *ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, ২ এপ্রিল ২০১৮।

ইতিহাস

যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ : ১৯৭১-এ ‘গঙ্গা’ হাইজ্যাক হয়েছিল

হাসান ফেরদৌস

এক.

মোহাম্মদ আশরাফ কুরেশি মারা গেছেন। পাকিস্তানি পত্রিকা *ডন* জানিয়েছে, ২০১৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ৫৮ বছর বয়স্ক কুরেশি হৃদ্‌রোগে মারা যান। নিজের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী কুরেশিকে পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের মুজাফফরাবাদে কবর দেওয়া হয়েছে।

১৯৭১ সালে আশরাফ কুরেশি ও তাঁর চাচাতো ভাই হাশিম কুরেশি ‘গঙ্গা’ নামের ভারতীয় এয়ারলাইনসের একটি ফোক্কার ফ্রেন্ডশিপ বিমান শ্রীনগর থেকে হাইজ্যাক করে লাহোর নিয়ে আসেন। সেই ঘটনা এখন হয়তো অনেকের আর মনে নেই, কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তার রয়েছে গভীর সম্পর্ক। কুরেশি ভ্রাতৃদ্বয় হয়তো বাংলাদেশের—সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তানের—কথা মাথায় রেখে সেই বিমান হাইজ্যাক করেননি। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর দুই মাস আগের এই ঘটনা, পাকিস্তানের রাজনীতি যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে এগোবে, এই হিসাব তাঁদের করার কথা নয়। তবে তাঁরা না করলেও যাঁরা তাঁদের দিয়ে এই কাজ করিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ঘাত এই হিসাব করেছিলেন।

কিন্তু কে করিয়েছিলেন এই কাজ—পাকিস্তানের সেনাকর্তারা, না ভারতীয় গোয়েন্দা দপ্তর?

ঘটনার শুরু ১৯৭১ সালের জানুয়ারি। পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন শেষ হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সর্বাধিক আসন দখল করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাদ সাধলেন পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের

দলগুলোর মধ্যে সর্বাধিক আসন পেয়েছেন। তিনিও সরকার গঠনের দাবিদার, তাঁর পেছনে শক্ত সমর্থন দেশের সেনাবাহিনীর। এত দিন অবাঙালিরা পাকিস্তানের ক্ষমতার কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করেছে, বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো ইচ্ছাই তাঁদের নেই। এই কাজে ভুট্টো তাঁদের তুরুপের তাস।

জানুয়ারির শুরু থেকে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান দেশের ক্ষমতাভার হস্তান্তরের নামে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। পাশাপাশি চলছে পাকিস্তান থেকে বিমান বোঝাই করে সৈনিক ও অস্ত্রসম্ভার আমদানি। করাচি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত জাহাজে মানুষ ও অস্ত্র পাঠাতে তাঁদের সময় লাগে ২১ দিন। পাকিস্তানি জেনারেলদের হাতে তত সময় নেই, তাঁদের চিন্তা যত দ্রুত পূর্ণ আয়োজন সম্পন্ন করে 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু করা। জাহাজে নয়, ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও বিমানে পাঠানোই তাঁদের অগ্রাধিকার। তবে সমস্যা একটাই, বিমানে সৈন্য ও অস্ত্র পাঠাতে হলে ভারতের আকাশসীমা অতিক্রম করতে হবে। ভারত যাতে বাধা দিতে না পারে, সে জন্য গভীর গোপনীয়তায় যাত্রীবাহী বিমানে অস্ত্র ও সৈন্য ঢাকায় ও চট্টগ্রামে পাঠানো শুরু হলো।

এরই মধ্যে ঘটল গঙ্গা হাইজ্যাকের ঘটনা।

ঘটনার শুরু ৩০ জানুয়ারি। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে শ্রীনগরে বেশ ভারী বরফ পড়ে। আগের দিনও পড়েছিল। রানওয়েতে বরফ জমেছিল, সেসব পরিষ্কারে বেশ কিছু সময় লেগে গেল। তারপরও ৩০ আসনের গঙ্গা ফোক্কার ফ্রেন্ডশিপ বিমানটি শ্রীনগর থেকে জম্মু যাওয়ার জন্য যথাসময়ে তৈরি। মোট যাত্রী ২৬ জন, সঙ্গে বিমানের পাইলট ক্যাপ্টেন এম কে কাচরু, কো-পাইলট মোহন সিং ও ক্রু নিয়ে আরও চারজন। পুরোনো বিমান, অনেক দিন সেবা দিয়েছে, ভারতীয় বিমান কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে গঙ্গাকে অবসর দেওয়া হবে। ৩০ জানুয়ারির সেই যাত্রাই হবে গঙ্গার শেষ যাত্রা। ক্যাপ্টেন কাচরু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ বৈমানিক, ফোক্কারের আদ্যোপান্ত তাঁর জানা, তাঁকেই ভার দেওয়া হলো গঙ্গার বিদায়ী ফ্লাইট পরিচালনার।

যাত্রীদের অধিকাংশ সামরিক বাহিনীর সদস্য ও তাঁদের পরিবার। কেউ কেউ শ্রীনগর থেকে জম্মু যাচ্ছেন হয় ছুটিতে, নয়তো নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করতে। শুরুতেই একটা অস্বস্তি ভাব, কী অজানা ভয় যাত্রীদের মনে। আকাশ পরিষ্কার, ক্যাপ্টেন কাচরু সবাইকে আশ্বস্ত করলেন ৯০ মাইলের বিমানপথ, জম্মু পৌঁছাতে লাগবে বড়জোর ৪৫ মিনিট। পলক পড়তে না পড়তেই জম্মুর আকাশে প্রবেশ করল গঙ্গা। যাত্রীরা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, মেঘশূন্য নির্মল আকাশ।

তখনই ঘটল বিপত্তি। বিমানের ককপিটে দাঁড়িয়ে দুই কাশ্মীরি যুবক, একজনের হাতে খুদে পিস্তল, অন্যজনের হাতে গ্রেনেড। তাঁদের একজন, ১৬ কি ১৭ বছর বয়সের প্রায় বালক হাশিম কুরেশি ককপিটের দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে, পাইলটের মাথার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে বললেন, 'জম্মু নয়, এই বিমানপথ ঘুরিয়ে নিয়ে

যেতে হবে রাওয়ালপিন্ডি। নির্দেশ অমান্য করলে গুলিতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া হবে, ধ্বংস করে দেওয়া হবে। এই দেখো গ্রেনেড।' ককপিটের বাইরে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আশরাফ কুরেশি, তিনিও প্রায় একই বয়সী, যাত্রীদের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে বললেন, কেউ আসন থেকে ওঠার চেষ্টা করলে গুলি করা হবে।

হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। পাইলট বা যাত্রী কারোরই এর আগে বিমান হাইজ্যাকের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। উচ্চ স্বরে কাঁদতে শুরু করল অনেকে, যার যার ধর্মগ্রন্থ থেকে মন্ত্র পাঠ করে ঈশ্বরের কাছে পরিত্রাণ প্রার্থনা করল কেউ কেউ।

যুবক দুজনের হাতে যে বন্দুক ছিল, তা ছিল খেলনামাত্র। যে গ্রেনেডের হুমকি তাঁরা দিয়েছিলেন, সেটিও নকল, কাঠের তৈরি। কিন্তু সে কথা জানার কথা নয় বিমানচালক অথবা যাত্রীদের। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন ক্যাপ্টেন কাচরু। এতগুলো যাত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁর, কোনো রকম অতিসাহসী কিছু করার ভাবনা তাঁর মাথায় নেই। বিনা প্রতিবাদে জম্মুর আকাশপথ থেকে যাত্রাপথ বদলালেন। এবার লক্ষ্য লাহোর। তাঁর বিমানে রাওয়ালপিন্ডি পর্যন্ত ওড়ার জ্বালানি নেই, সে কারণেই লাহোর। হাইজ্যাকার দুজনের চোখ এড়িয়ে তিনি এয়ার কন্ট্রোলকে পরিস্থিতি অবহিত করতে সক্ষম হলেন। অল্প সময়ের ভেতরেই ভারতীয় বিমানবাহিনীর একাধিক যুদ্ধবিমান উড়ে এল, কিন্তু গঙ্গাকে আটকানো গেল না। পাকিস্তানি আকাশসীমায় প্রবেশ করামাত্রই দুটি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান পাহারা দিয়ে বিমানটিকে নিয়ে গেল লাহোর পর্যন্ত।

ততক্ষণে পরিষ্কার হয়েছে, এই দুই যুবক কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধা, কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্য, কাশ্মীরে ভারতীয় অবরোধের প্রতিবাদে তাঁরা এই বিমান হাইজ্যাক করেছেন। এই ফ্রন্টের নাম আগে কেউ শোনেনি, কিন্তু তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কখনো পাকিস্তানি, কখনো ভারতীয় গোয়েন্দাদের অর্থানুকূল্যে কাশ্মীরের উভয় পাড়েই হরহামেশা নতুন নতুন মুক্তি ফ্রন্টের আত্মপ্রকাশ ঘটছে। এটিও সে রকম একটি।

যথাসময়ে গঙ্গা এসে ভিড়ল লাহোরে, পরিবহন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কোনো ঝামেলা ছাড়াই অবতরণ করল সেই বিমান। ততক্ষণে বিমানবন্দরে পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণভার নিয়েছে, বিমান অবতরণ করামাত্রই সশস্ত্র পাকিস্তানি কমান্ডো বিমানটি ঘিরে ধরল, কয়েকজন কমান্ডো বিমানের ভেতরে এসে কথা বলে গেলেন ছিনতাইকারীদের সঙ্গে। মনে হলো তাঁরা একে অন্যকে চেনেন, ঢোকামাত্রই কাশ্মীরি যুবকদ্বয় বিনা বাক্যে পাকিস্তানি নিরাপত্তা সদস্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। দুই হাত আকাশে তুলে, আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে তাঁরা বীরের মতো বিমানের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন।

ততক্ষণে খবর রটে গেছে যে দুই কাশ্মীরি যুবক একটি ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে লাহোর বন্দরে নিয়ে এসেছেন। তাঁরা কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্য, বিশ্বের

মানুষকে ভারতীয় অবরোধের বিরুদ্ধে সচেতন করতে এই দুঃসাহসী পথ বেছে নিয়েছেন। মিডিয়ার লোকজন ছুটে এলেন, পিপলস পার্টির নেতা মাহমুদ আলী কাসুরিসহ বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাও এসে হাজির। কাশ্মীর পাকিস্তানিদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এই কাশ্মীর নিয়ে ইতিমধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কয়েক দফা যুদ্ধ হয়ে গেছে। সীমান্তের ওপারে যাঁরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছেন, পাকিস্তানিদের চোখে তাঁরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। সে রকম দুই মুক্তিযোদ্ধা ভারতীয় বিমান হাইজ্যাক করে এনেছেন, এ তো দারুণ খবর!

৩১ জানুয়ারি ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা সেরে ফিরছিলেন জুলফিকার ভুট্টো। তাঁর বিমান লাহোর বিমানবন্দরে ভিড়তে না ভিড়তেই তাঁর দলের নেতা-কর্মীরা ছুটে এলেন। অন্যান্য দলের নেতারাও। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার লোকের ভিড় বিমানবন্দরের চারদিকে, নারায়ে তাকবির ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রকম্পিত। কিছু বোঝার আগেই ভুট্টোকে প্রায় ঠেলে সবাই নিয়ে এলেন ছিনতাই করা বিমানের কাছে।

নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন চারদিকে গিজগিজ করছে, তাদের ডিঙিয়ে ভুট্টো দেখা করলেন যুবকদ্বয়ের সঙ্গে। ভুট্টো তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা বলে সম্বোধন করলেন, আশ্বাস দিলেন তাঁদের, যাতে পাকিস্তানে আশ্রয় দেওয়া হয়, সে জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। যুবক দুজনের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'এই বিমান ভারতে ফেরত যেতে দেওয়া হবে না, কারণ সেটা হবে আমাদের পরাজয়।' কয়েক হাজার মানুষ তখন কাশ্মীরের নামে মুহুর্মুহু স্লোগান তুলছে। স্মিত হেসে বীরের মতো নেমে এলেন ভুট্টো।

সেটি ছিল এই নাটকের শুরু।

হাশিম কুরেশি পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জানান, ভারতের জেলে আটক ৩৬ জন কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। যতক্ষণ তাঁদের মুক্তি না দেওয়া হচ্ছে, বিমানযাত্রীদের জিম্মি হিসেবে আটকে রাখা হবে। কুরেশি ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে ততক্ষণ আর বিমানের নিয়ন্ত্রণভার নেই, বিমান অবতরণের ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তাঁরা নেমে এসে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, বিমানের পুরো নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে পাকিস্তানি কমান্ডোদের হাতে। তাঁদের কথা শূন্য আস্ফালন ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ এল ভারতের কাছ থেকে। বিমান ও যাত্রীদের অক্ষত অবস্থায় ফেরত দিতে হবে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হলো। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কঠোর ভাষায় ছিনতাইয়ের ঘটনার প্রতিবাদ জানালেন। প্রায় রাতারাতি দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিমান ছিনতাইয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন হলো। সবচেয়ে বড় বিক্ষোভটি হলো দিল্লিতে, পাকিস্তানি হাইকমিশনের বাইরে।

কাশ্মীরি যুবক দুজন কারা, বিমানযাত্রীদের নিয়ে কী করা হবে, বিমানটিরই বা কী হবে—এসব প্রশ্নে তখন তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কাছে

আত্মসমর্পণের পরপরই হাশিম কুরেশি পাকিস্তানে অবস্থানরত কাশ্মীরি নেতা মকবুল বাট অথবা ফারুক হায়দারের সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। মকবুল বাটকে পাওয়া গেল না, কথা হলো ফারুক হায়দারের সঙ্গে। পাকিস্তানি সাংবাদিক আরিফ জামাল এই কথোপকথনের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে :

হাশিম কুরেশি বিমান থেকে নেমে রাওয়ালপিন্ডিতে ড. ফারুক হায়দারকে ফোন করে জানালেন 'পাখিটি' যথাসময়ে অবতরণ করেছে। হায়দার বললেন, মকবুল বাটের সঙ্গে কথা বলে তিনি দশ মিনিটের মধ্যে তাঁদের ফোন করবেন। বাট সে সময় পেশোয়ারে। পরে নিজেকে ফারুক হায়দার নাম নিয়ে একজন ফোন করে হাশিমকে জানালেন, বিমানের যাত্রীদের তাঁরা যেন অবিলম্বে মুক্তি দেন। ছিনতাইকারীদের ইচ্ছা ছিল যাত্রীদের জিম্মি রেখে ভারতে আটক কাশ্মীরি বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করা। কিন্তু ড. হায়দারের নির্দেশ জানতে পেরে তাঁরা আটক যাত্রীদের মুক্তি দিতে সম্মত হলেন। পরে জানা গেল ফারুক হায়দার নাম দিয়ে যে লোকটি ফোন করেছিলেন, তিনি আসলে একজন পাকিস্তানি এজেন্ট।[১]

কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলনে মকবুল বাট অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। জম্মু-কাশ্মীর ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা হিসেবে কাশ্মীরিদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়, শ্রদ্ধেয়। পাকিস্তানের সেনা ও গোয়েন্দা বাহিনীর সঙ্গে তিনি আগাগোড়াই নিকট সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নাশকতামূলক তৎপরতায় তাঁর অংশগ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। ১৯৬৮ সালে শ্রীনগরে এক ভারতীয় পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যার অভিযোগে মকবুলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল, কিন্তু জেলকক্ষের ভেতরে সুড়ঙ্গ কেটে তিনি পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এরপর থেকে তিনি সে দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর তত্ত্বাবধানেই ছিলেন। গঙ্গা ছিনতাইয়ের ঘটনার সময় তিনি লাহোরের বাইরে ছিলেন, খবর পাওয়ামাত্রই ফিরে এসে পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নিলেন।

পরবর্তী ঘটনাগুলো ঘটে গেল খুব দ্রুত।

১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান রেডিও থেকে জানানো হলো, কাশ্মীরি যুবকদ্বয় ভারতের জেলে আটক ৩৬ জন কাশ্মীরি রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করেছেন এবং নিজেদের জন্য পাকিস্তানে ও সে দেশে অবস্থানরত তাঁদের স্বজন-পরিজনের নিরাপত্তা দাবি করেছেন। জবাবে ভারত জানাল, শুধু বিমান নয়, ছিনতাইকারীদেরও ফেরত দিতে হবে বিনা শর্তে। এই প্রশ্নে কোনো আপস নেই। তাদের পাল্টা জবাবে পাকিস্তান জানাল, যুবক দুজন ভারতীয় নাগরিক নন, তাঁরা কাশ্মীরি, পাকিস্তান তাঁদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে। অতএব তাঁদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। পাকিস্তান অবশ্য তাদের গলার স্বর কিছুটা নমনীয় করে জানাল, কাশ্মীরি 'মুক্তিযোদ্ধা' দুজনের সম্মতিতে যাত্রীদের মুক্তি দেওয়া হবে, তবে এ জন্য পূর্বশর্ত

হিসেবে তাঁরা ভারতে আটক ৩৬ জন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবি করেছেন। ভারত সে দাবি প্রত্যাখ্যান করে জানাল, এমন দাবি মানার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অন্য যেকোনো বিষয়ে আলোচনার আগে জিম্মি যাত্রীদের মুক্তি দিতে হবে। বিমানযাত্রীদের অবিলম্বে ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত একটি বিমান প্রস্তুত রেখেছে বলে জানাল।

ছিনতাইকারী দুজন আশা করেছিলেন, বিমানযাত্রীদের মুক্তির প্রশ্নে তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটল উল্টো, তাঁদের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা ছাড়াই দুই দিন পর সীমান্ত দিয়ে স্থলপথে ভারতীয় যাত্রীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হলো। কোনো বিপত্তি ছাড়াই কঠোর নিরাপত্তার ভেতর তারা দেশে ফিরল। ৩ ফেব্রুয়ারির দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর প্রতিবেদনে জানানো হয়, লাহোরে তাঁদের হোটেল থেকে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের একটি ভ্যানে ২৬ জন যাত্রী ও ৪ জন ক্রুকে ভারতীয় সীমান্তের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা গান্ধা সিংওয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করে।

এক দিন পরে ঘটল অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা।

বিমানবন্দরের এক ধারে বিমানটি সরিয়ে আনা হয়েছিল, চারপাশে পাকিস্তানি নিরাপত্তা প্রহরী। কুরেশি ভ্রাতৃদ্বয় ইচ্ছেমতো সে বিমানে ঢুকছেন, বেরোচ্ছেন। সঙ্গে পাকিস্তানি নিরাপত্তাকর্মীরা। তন্নতন্ন করে বিমানটি খুঁজে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র সংগ্রহ করে নিলেন তাঁরা। এরপর কাশ্মীরি যুবকদ্বয় পাকিস্তানি নিরাপত্তা প্রহরায় পেট্রল ছিটিয়ে বিমানটি জ্বালিয়ে দিলেন। সবার চোখের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে একসময় ছাই হয়ে গেল বিমানটি। সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিল এক জোড়া ফায়ার ব্রিগেড, তারাও চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করল না। সেনাসদস্য, সরকারি কর্মচারী, তথ্যমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং কয়েক হাজার দর্শক কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা উল্লাস নিয়ে এই অগ্ন্যুৎসব প্রত্যক্ষ করলেন। আগুনে ছিনতাইকারী দুজন সামান্য ঝলসে গিয়েছিলেন, পাকিস্তানি প্রহরায় তাঁদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলো। এ ছাড়া অন্য কেউ বড় ধরনের আহত হলেন না।

বিমান ধ্বংসের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। পাকিস্তানের ভেতর সে অগ্ন্যুৎসবকে স্বাগত জানানো হলো মিটিং-মিছিল করে। কুরেশি ভ্রাতৃদ্বয় রাতারাতি জাতীয় বীরে পরিণত হলেন, রেডিও-টিভি ও পত্রপত্রিকায় সর্বত্র তাঁদের জয়গান।

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বিমান জ্বালানোর ঘটনার দায়ভার চাপাল ভারতের ওপর। বলা হলো, কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে বন্দী কাশ্মীরি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি করেছিলেন, ন্যায্য সে দাবি প্রত্যাখ্যান করায় ছিনতাইকৃত বিমানটি জ্বালিয়ে দিয়ে সাহসিকতার কাজ করেছেন এই দুই কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধা।

ঢাকার *ইত্তেফাক* পত্রিকায় ৪ ফেব্রুয়ারির সংখ্যার শিরোনাম ছিল, 'ডিনামাইট দ্বারা বিমানটি উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে: হাইজ্যাকারদের দাবি অনুযায়ী বন্দী

কাশ্মীরিদের মুক্তিদানে ভারতের অস্বীকৃতির জের।'

'দুজন কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক বলপূর্বক লাহোরে আনীত ভারতীয় বিমানটি আজ রাতে (৩ ফেব্রুয়ারি) উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তান সময় রাত ঠিক ৮টা ৩ মিনিটে বিমানে ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।'

ইত্তেফাক জানায়, অপহরণকৃত বিমানটি লাহোরে অবতরণের ৭৯ ঘণ্টা পর এই বিস্ফোরণ ঘটল।

এই ঘটনা—অথবা দুর্ঘটনা—বিষয়ে পাকিস্তানি মনোভাবের একটি প্রতিফলন মেলে জুলফিকার ভুট্টোর বক্তব্যে। ৩১ জানুয়ারি লাহোরে ফিরেই তিনি ছিনতাইকারীদের সঙ্গে কোলাকুলি করে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ৪ ফেব্রুয়ারি, বিমান ধ্বংসের পর এক বিবৃতিতে তিনি হাইজ্যাকারদ্বয়কে 'সাহসী যোদ্ধা' নামে অভিহিত করে বললেন, পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই, যা কাশ্মীরিদের ন্যায্য দাবি আদায়ে দমিয়ে রাখতে পারে। তিনি আরও বলেন, এই ঘটনার জন্য পাকিস্তান বা পাকিস্তানের জনগণ দায়ী নয়। *ইত্তেফাক* জানাচ্ছে :

'জনাব ভুট্টো বলেন যে আইনগতভাবে ভারতীয় বিমানটি পাকিস্তানি আওতায় ছিল এবং কোনো পাকিস্তানি নাগরিক বিমানটি উড়াইয়া দিলে তাহা বিপর্যয়মূলক হইত। কিন্তু ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দুইজন কাশ্মীরি কমান্ডো বিমানটি ধ্বংস করিয়াছে, তাই পাকিস্তানের সরকার বা জনগণ ইহার জন্য দায়ী নয়।'[২]

দেখা যাচ্ছে বিমান ধ্বংসের ব্যাপারে ভুট্টোর ও পাকিস্তান সরকারের আনুষ্ঠানিক অবস্থানের কার্যত কোনো প্রভেদ ছিল না। উভয়েই ঘটনাটিকে স্বাগত জানালেন। ভারতীয় বিমান অপহরণ ও তা জ্বালিয়ে দেওয়ার এই ঘটনার একজন সাক্ষী ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক সামরিক শাসক আইয়ুব খান। নিজের আত্মজীবনীতে তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

'আজকের পাকিস্তানে গরম-গরম খবরের অভাব নেই। প্রতিদিনই কিছু না কিছু ঘটছে। যেমন ধরুন ভারতীয় বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনাটি। জনা দুই কাশ্মীরি যুবক একটি ভারতীয় বিমান শ্রীনগর থেকে জম্মু যাওয়ার পথে ছিনতাই করে লাহোর নিয়ে আসেন। তাঁরা যাত্রীদের নেমে যেতে দিলেও বিমানটি নিজের দখলে রাখেন। তাঁরা ভারতে আটক তাঁদের কমরেডদের মুক্তি ও তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে বিমানটি উড়িয়ে দেবেন বলে জানান। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাঁদের আত্মসমর্পণের নানা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ভারত তাঁদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে, এই কথা ভারতীয় বেতারে শোনার পর বিমানটি তাঁরা উড়িয়ে দেন। যাত্রীদের অবশ্য খুবই ভালোভাবে রাখা হয়েছিল, পরে স্থলপথে তাঁদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়। তা সত্ত্বেও ভারত এই কাজের জন্য পাকিস্তানকে দোষারোপ করে।'[৩]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সঙ্গে সে সময় তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের জটিল আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো যেভাবে সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর বিলম্বিত করবেন অথবা পুরো প্রক্রিয়াটিই বানচাল করে দেবেন, সে কথা তিনি খুব ভালো করে জানতেন। একদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনার ভান চলছে, অন্যদিকে পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ও সৈন্য ঢালাও হারে আমদানি হচ্ছে। এটি একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্তের অংশ, এ কথা বুঝতে রকেটবিজ্ঞানী হতে হয় না। তার ওপর ঘটল বিমান ছিনতাই ও বোমা মেরে তা উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা। এর পেছনে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষের হাত নেই, এ কথা নিঃসন্দেহচিত্তে মেনে নেওয়া কঠিন।

এই বিস্ফোরণ কি তাহলে ভারতের সঙ্গে নতুন যুদ্ধের পাঁয়তারা, যার অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বাতিল হয়ে যেতে পারে?

২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বিমান উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাকে ক্ষমতা হস্তান্তর 'স্যাবোটাজ' করার একটি চক্রান্ত বলে অভিহিত করলেন।

'আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে হাইজ্যাক করা ভারতীয় বিমানটি উড়াইয়া দেওয়ার ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঘটনার তিনি নিন্দা করিয়াছেন। পরিস্থিতি ঘোলাটে করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরকে "স্যাবোটাজ" করার বিশেষ ষড়যন্ত্র করিয়া দেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির কায়েমি স্বার্থবাদী চেষ্টার বিরুদ্ধে শেখ সাহেব দেশের জনগণকে সম্পূর্ণ সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।'[৪]

ঘটনাটি যে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর মনে কোনো সংশয় ছিল না। ঢাকা থেকে প্রকাশিত তাঁর বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু আরও বললেন :

'দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এমন ঘটনা ঠেকানো সম্ভব ছিল। জাতির জীবনে এখন আমরা এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন, এই অবস্থায় যেকোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি কেবল নাশকতাবাদী ও ষড়যন্ত্রকারীদের হাত শক্ত করবে।'[৫]

বিমান উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার পেছনে যে পাকিস্তান, সে সন্দেহের কথা ভারত সরকার কোনো রাখঢাক ছাড়াই জানাল। এই ঘটনার সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনী প্রচারণা উপলক্ষে কলকাতায় অবস্থান করছিলেন, সেখান থেকে এক বিবৃতিতে তিনি কঠোর ভাষায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

'প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় বিমান হাইজ্যাক করার ও উড়াইয়া দেওয়ার জন্য আজ পাকিস্তানকেই দায়ী করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলায় এক নির্বাচনী প্রচারণাকালে তিনি বলেন, ভারতীয় বিমানটি গত ৩০ জানুয়ারি হাইজ্যাক করিয়া লাহোর লইয়া যাইতে সহায়তা করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ভারত সরকার ও জনগণ বিস্মিত হইয়াছেন। মিসেস গান্ধী পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার প্রদান করিয়া বলেন, এইরূপ কার্যকলাপে উৎসাহ প্রদান

গুরুতর পরিস্থিতি ডাকিয়া আনিবে।'[৬]

ঘটনাটিকে ভারত যে কী পরিমাণ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবে, অথবা প্রতিক্রিয়া হিসেবে কী ব্যবস্থা নেবে, পাকিস্তান সে হিসাব যথাযথভাবে করে ওঠেনি। ভারতবিদ্বেষী মনোভাব চাঙা হলে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বরাবরই তা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ভারতের সঙ্গে সামরিক উত্তেজনার অজুহাত দেখিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর বাতিল করাও হিসাবের মধ্যে থেকে থাকতে পারে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারত যে ব্যবস্থাটি গ্রহণ করে, তা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত।

বিমান জ্বালিয়ে দেওয়ার পরপরই এক ঘোষণায় ভারত সরকার নিজের দেশের ওপর দিয়ে সব পাকিস্তানি সামরিক বিমান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এক দিন পর এই নিষেধাজ্ঞা বেসামরিক বিমানের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়। দৈনিক *ডন* জানাচ্ছে :

৪ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকার তার আকাশসীমার ওপর দিয়ে যেকোনো পাকিস্তানি বিমানের চলাচল নিষিদ্ধ করেছে। এদিকে দ্বিতীয় দিনের মতো নয়াদিল্লির পাকিস্তানি হাইকমিশনে হাজার হাজার ভারতীয় ছাত্রের সহিংস বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ভারত সরকার পাকিস্তানকে জানিয়েছে, বিমান, যাত্রী, ক্রু ও বিমান সংরক্ষিত চিঠিপত্র বাবদ ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকবে। এক দিন আগে ভারত মঙ্গলবার লাহোর বিমানবন্দরে ভারতীয় বিমান উড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ভারতীয় আকাশসীমা ব্যবহার করে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে। এই নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়ে ভারত সরকারের একটি নোট পাকিস্তান হাইকমিশনে হস্তান্তরের সময় প্রায় চার হাজার ভারতীয় ছাত্র সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন।[৭]

বিমান চলাচল বন্ধে ভারতীয় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে বিবৃতিটি প্রদান করে, তাতে এ ব্যাপারে নিজের কোনো দায়দায়িত্ব স্বীকারের বদলে হাইজ্যাকের ঘটনাটি কাশ্মীরে ভারতীয় নির্যাতন ও অবরোধের সরাসরি ফলাফল বলে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।

ভারত যে স্বাভাবিক কূটনৈতিক পথ অনুসরণের বদলে এ ঘটনাকে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করছে, তাতে পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত দুঃখিত। পাকিস্তানি বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করা ছাড়াও দিল্লিতে পাকিস্তানি হাইকমিশনের সামনে অব্যাহত বিক্ষোভ চলছে, এমনকি হাইকমিশনের সহায়-সম্পত্তি আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে।[৮]

ভারতীয় সিদ্ধান্তের যে একটি সামরিক প্রতিক্রিয়া রয়েছে, এ কথা অনুধাবন করতে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের তেমন বিলম্ব হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যদি পূর্ব

পাকিস্তানের সরাসরি যোগাযোগ ব্যাহত হয়, তাহলে শেখ মুজিবুর রহমানের হাত আরও শক্ত হয়, এ কথাও বলা শুরু হলো। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক উপস্থিতি জোরদার করা হচ্ছিল, এখন তাতে বড় রকমের বাধা পড়বে। আইয়ুব খান নিজের ডায়েরিতে এই নিয়ে লিখেছেন :

'বিমান ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় ভারত শক্ত প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং সে দেশের আকাশসীমায় পাকিস্তানি সামরিক ও বেসামরিক বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করেছে। এর মানে হলো, এখন পাকিস্তানি বিমানগুলোকে কলম্বো (শ্রীলঙ্কা) হয়ে যেতে হলে অনেক বেশি সময় লাগবে। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে, এই সময় এ রকম একটি ঘটনা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতকেই শক্ত করবে। আমি মোটেই বিস্মিত হব না, যদি বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ভারত বিষয়টি বিবেচনায় রেখে থাকে। বস্তুত, আমাদের এই শাসনতান্ত্রিক সংকটের সময় বাঙালিদের মনোভাব বিষিয়ে তুলতে ভারত সম্ভবপর সবকিছুই করবে।'[৯]

সপ্তাহ ঘুরতেই না-ঘুরতেই পাকিস্তানের মানুষের মনোভাব বদলে যাওয়া শুরু করল। অনেকেই বলা শুরু করলেন, নির্ঘাত এর পেছনে ভারতের হাত রয়েছে। হাইজ্যাকারদ্বয় সম্ভবত ভারতের এজেন্ট, এমন কথাও কেউ কেউ বললেন। সমস্যা হলো, কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানিদের তীব্র অনুভূতি রয়েছে। মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলটি তাদের রাষ্ট্রের সঙ্গে একীভূত হবে, এমন আকুতি তাদের সবার মনেই রয়েছে। কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের এই দুই সদস্যের বিরুদ্ধে সরাসরি এমন অভিযোগ তুলতে কেউ কেউ ইতস্তত করলেন। মকবুল বাট বা ড. হায়দার তাদের কাছে অপরিচিত নাম নয়, দীর্ঘদিন পাকিস্তানের মাটি থেকে, পাকিস্তানের সামরিক সমর্থনে ভারতের অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়াই করে যাচ্ছেন। তাঁরা দুজনেই হাইজ্যাকারদ্বয়ের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন, বিমান ধ্বংসের সিদ্ধান্তও নিয়েছেন একসঙ্গে। ফলে হাইজ্যাকারদ্বয়ের পরিচয় নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্দেহ রয়েই গেল। হাইজ্যাক হলো, কিন্তু বিমানটি জ্বালিয়ে দেওয়া হলো কেন? এটা কি তাহলে আসলে ভারতের একটি চাল? আইয়ুব খানের কথাতে এই সন্দেহের আভাস মেলে।

ভারতীয় বিমানের ছিনতাইয়ের ঘটনা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শত্রুতা তীব্র করেছে। এ কথা পরিষ্কার যে কাশ্মীরিরা এই অধিকৃত অঞ্চলের প্রতি পাকিস্তানিদের সহানুভূতি নিয়ে খেলেছে, রাজনীতি করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক কাশ্মীরি বাস করে, তারা জানে যে এই অঞ্চলের, বিশেষ করে পাঞ্জাবের মানুষ কাশ্মীর প্রশ্নে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। নিজেদের প্রয়োজনে কাশ্মীরি নেতারা এই আবেগকে ব্যবহার করেছেন। ইব্রাহিম ও খুরশিদ (শেখ আবদুল্লাহর নিকট সহকর্মী ও কাশ্মীর কনফারেন্সের নেতা) এবং তাদের মতো অন্যরা নানা রকম নাশকতামূলক কাজে

জড়িয়ে পড়েছে, এরাই আবার অনেক সময় পাকিস্তানিদের আত্মত্যাগের মর্যাদা দেয় না। এখন দেখা যাচ্ছে, এরা ফের তৎপর হয়েছে। আমি যখন ক্ষমতায় ছিলাম, এদের কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করেছি। ভুট্টোও এদের নষ্টামিকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। পত্রপত্রিকায় কাশ্মীরিদের সমর্থন করে—এমন বিস্তর লোক রয়েছে, যারা কাশ্মীর প্রশ্ন ব্যবহার করে পাকিস্তান ধ্বংসে কোনো আপত্তি দেখে না।[১০]

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে আসছিল। একদিকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে চলছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনার নামে এক প্রহসন, অন্যদিকে সেনা কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মাটিতে পুরোদস্তুর সামরিক হামলার আয়োজন দ্রুতগতিতে সারছিল। ভারতের ওপর দিয়ে বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পুনর্জ্বালানি গ্রহণের জন্য তাদের বাধ্য হয়ে কলম্বো বিমানবন্দর হয়ে সেনাসদস্য ও যুদ্ধরসদ পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হলো। এর ফলে শুধু যে অতিরিক্ত সময় লাগত—তা-ই নয়, যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যয় বেড়ে গেল বহুগুণে। জেনারেল রাও ফরমান আলী সে কথা স্মরণ করে লিখেছেন, শ্রীলঙ্কা এই সুবিধাটুকু না দিলে পাকিস্তানকে বড় ধরনের বিপদে পড়তে হতো।

পাকিস্তানকে শ্রীলঙ্কার ওপর দিয়ে বিমান চালাতে বাধ্য করা হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত শ্রীলঙ্কায় তখন একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ও বলিষ্ঠ সরকার ছিল। শ্রীলঙ্কা বিমান অবতরণের অনুমতি না দিলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান যোগাযোগ ভেঙে পড়ত কিংবা পড়ত প্রচণ্ড চাপে। পুনরায় জ্বালানি নেওয়ার জন্য অবতরণ করা ছাড়া সি-১৩০ সামরিক বিমানের পক্ষে সরাসরি ঢাকা যাওয়া সম্ভব ছিল না। শ্রীলঙ্কা এই সুবিধাটুকু দিয়েছিল।[১১]

একই কথা বলেছেন আরেক পাকিস্তানি জেনারেল, ফজল মুকিম খান। তিনি লিখেছেন, ভারতের আকাশ যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের ফলে দুই পাকিস্তানের অংশের মধ্যে বিমান যাতায়াতের দূরত্ব দ্বিগুণের বেশি হয়ে পড়ে। এই ঘটনা ঘটল এমন এক সময়ে, যখন দুই অংশের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি। তা ছাড়া এই ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে বিচ্ছিন্নতাবোধ বাড়িয়ে তোলে।[১২]

ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ভারতের পরিকল্পনা এবং এর পেছনে একটি সামরিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে, সে কথা আরও খোলাসা করে লিখেছেন রাও ফরমান আলী।

ভারতের পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধকালীন বিচ্ছিন্নতার স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলা, যা পূর্ব পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিটির ব্যাপারে পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করতে উৎসাহিত করেছিল। মুজিব একে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানে বিলম্ব ঘটানোর মাধ্যমে ছয় দফাকে

অবদমিত ও খর্বিত করার উদ্দেশ্যে কায়েমি স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন। বেশি বুদ্ধিমান হিসেবে প্রশংসিত ভুট্টোর মুজিবের চেয়ে পরিষ্কারভাবে ছিনতাই ঘটনার ফলাফল অনুধাবন করা উচিত ছিল। ছিনতাইকারীদের সঙ্গে তাঁর করমর্দন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যবিহীন ছিল না। কারণ, এর পরপরই বিমানটি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১৩]

এ কথার অর্থ এই নয়, ভারতের ওপর দিয়ে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ হলেও পাকিস্তানের যুদ্ধ প্রস্তুতি বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান বাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজি অভিযোগ করেছেন, তাঁর হাতে বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণে ছিল মোটে তিনটি টুটাফাটা ডিভিশন, যাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে সমর-প্রস্তুতি ছিল না।[১৪] ভারতীয় আকাশসীমায় বিমান চলাচল নিষিদ্ধ হওয়ায় যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে বিঘ্নিত হয়েছিল, সন্দেহ নেই, কিন্তু এ কথায় কোনো ভুল নেই যে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বাংলাদেশে সামরিক অভিযানের গুরুত্ব অনুধাবন করে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সামরিক পরিবহনক্ষমতার সম্ভাব্য সব সুযোগ ও সম্পদ ব্যবহারে কসুর করেনি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিজস্ব ওয়েবসাইটে সে কথার সমর্থন মেলে। এই ওয়েবসাইট জানাচ্ছে, এপ্রিলে প্রথম সপ্তাহে শ্রীলঙ্কা হয়ে প্রায় পাঁচ হাজার মাইল বিরামহীন বিমান চালনার মাধ্যমে দুটি ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন ও অস্ত্রসমেত বেসামরিক সেনাসদস্য স্থানান্তর সম্ভব হয়। মে মাসের মধ্যেই কার্যত প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড ফেব্রুয়ারিতে যে ত্বরিত আক্রমণের পরিকল্পনা করে, তার অধীনে পিআইয়ের মাধ্যমে ২৭ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চের মধ্যে ১৩তম এফএফ ও ২২তম বালুচ ব্যাটালিয়ন পূর্ব পাকিস্তানে এসে পৌঁছায়। এরপর অবশ্য বিমানবাহিনী তেজগাঁও বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। অপারেশন সার্চলাইট শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সামরিক হাইকমান্ড পূর্ব পাকিস্তানে ১৪তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন অতিরিক্ত ৯ম ও ১৬তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন যোগ করার নির্দেশ দেয়। ২২ ফেব্রুয়ারির পর এই অতিরিক্ত ডিভিশনগুলো পিআইএ ও বিমানবাহিনীর যানে করে পূর্ব পাকিস্তানে এসে পৌঁছায়।[১৫]

যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে পাকিস্তানি জেনারেলরা যত সহজে ও নির্দ্বিধায় এই ছিনতাইয়ের জন্য ভারতকে দায়ী করেন, ঘটনার সময় বা অব্যবহিত পরে সে কথা তাঁদের কারও মুখে শোনা যায়নি। একাত্তরের যুদ্ধের সময় গঙ্গা হাইজ্যাকের প্রশ্নটি লোকের মুখে মুখে ফিরলেও এ নিয়ে সরকারিভাবে আশরাফ বা হাশিমের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও গৃহীত হয়নি। ভুট্টো ছিনতাইকারীদের 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করায় সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। অবস্থা বদলাল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে, বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের অপমানজনক ঘটনার পর। পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর কর্তাদের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে গেল

এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী কে, এই প্রশ্নে। বলির পাঁঠা হিসেবে খুঁজে পাওয়া গেল হাশিম ও আশরাফ কুরেশিকে। সরকারি নির্দেশে গঠিত হলো বিশেষ আদালত, হাশিম ও আশরাফ ছাড়াও মকবুল বাট, মির আবদুল কাইয়ুম, মির আবদুল মান্নান ও ফারুক হায়দারের বিরুদ্ধে বিদেশি শত্রুধারার অধীনে শুরু হলো বিচার।

সরকারপক্ষ হাশিম ও আশরাফকে ভারতের গোয়েন্দা দপ্তর রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইংয়ের (র) এজেন্ট হিসেবে চিত্রিত করে জানাল, গঙ্গা বিমান হাইজ্যাক ও তার ধ্বংসের প্রতিটি ঘটনাই একটি ব্যাপক চক্রান্তের অংশ। প্রায় আড়াই বছর ধরে চলল এই মামলা। হাশিম ও আশরাফ উভয়েই দৃঢ়ভাবে জানালেন, তাঁরা ভারতের এজেন্ট নন, কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই তাঁরা বিমান ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা আঁটেন। একই কথা বললেন মকবুল বাট। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁর পরিচিতি পাকিস্তানে কার্যত সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে, তাঁকে এই ষড়যন্ত্রের অংশ করায় পুরো বিচারপ্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। মকবুল এই বিচারের সময় যে লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান, তাতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। মকবুল বললেন :

'আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আমি নিজে অথবা কারও সঙ্গে একযোগে কোনো ষড়যন্ত্র করিনি। আমার চরিত্র বরাবর স্বচ্ছ ও বিতর্ক-ঊর্ধ্ব। তবে আমার একটাই অপরাধ, আর তা হলো অজ্ঞতা, বিত্তের লোভ, শোষণ, নির্যাতন, দাসত্ব ও দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যদি পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি ও এর আমলাতন্ত্র এবং সামরিক একনায়কতন্ত্র, যারা আসলে সাম্রাজ্যবাদের ফল, তারা যদি আমার কাজকে ষড়যন্ত্র মনে করে, তাহলে সে অভিযোগ মাথায় তুলে নিতে আমার কোনো দ্বিধা নেই।'

দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের পর আদালত তাঁর সিদ্ধান্তে জানান, সবাই নয়, একমাত্র হাশিম কুরেশি ভারতের এজেন্ট। শাস্তি হিসেবে তাঁকে ১৯ বছরের জেল দেওয়া হলো। বলা হলো, মকবুল বাট, আশরাফ কুরেশিসহ বাকি সবাই প্রকৃত কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধা, তবে অবৈধ অস্ত্র বহনের অভিযোগে তাঁদের নামমাত্র শাস্তি দেওয়া হলো। যেহেতু বিচারকালীন সময়ে তাঁরা কারাবাস করেছেন, ফলে এই বিচারের রায় ঘোষণার অব্যবহিত পরেই তাঁরা সবাই ছাড়া পেয়ে গেলেন।

শুধু ফেঁসে গেলেন হাশিম। পরে জেলবাস শেষে মুক্ত হওয়ার পর, তাঁর নিজস্ব ব্লগে একই অপরাধে তিনি ও আশরাফ কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি পেতে পারেন, তাতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাঁকে অবশ্য পুরো ১৯ বছর জেলে থাকতে হয়নি, ১৯৮০ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল আবেদন করলে তাঁর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ খারিজ করে মুক্তি দেওয়া হয়।

এরপর হাশিম ও আশরাফ নিজেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ বেছে নেন। হাশিম পাকিস্তান ছেড়ে নেদারল্যান্ডসে চলে যান ১৯৮৫ সালে। প্রায় ৩০ বছর ইউরোপে

কাটানোর পর তিনি ২০০০ সালে ভারতে ফিরে আসেন। কারণ হিসেবে বলেছেন, মৃত্যুর আগে তিনি নিজ দেশের মাটিতে ফিরতে চান। এই সময়ে অবশ্য হাশিম কুরেশির বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। তিনি কাশ্মীরিদের সশস্ত্র সংগ্রামের বদলে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। দিল্লিতে নামামাত্রই তাঁকে পাকিস্তানি এজেন্ট হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়। বছরখানেক জেলে কাটানোর পর ২০০১ সালের ডিসেম্বরে তাঁকে অসুস্থতার কারণে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। হাশিম কুরেশি এখন শ্রীনগরে বাস করেন, তাঁর নামে এখনো একটি মামলা চলছে।

আশরাফ কুরেশি মুক্তি পাওয়ার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে মাস্টার্স ও পরে পিএইচডি লাভ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনার পেশা বেছে নেন। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মকবুল বাট ১৯৭৪ সালে মুক্তিলাভের পর কিছুদিন পাকিস্তানে লিবারেশন ফ্রন্টের নেতা হিসেবে তৎপর ছিলেন। দুই বছর পর, ১৯৭৪ সালে তিনি গোপনে কাশ্মীরে ফিরে আসেন, লক্ষ্য ছিল, পাকিস্তানের সমর্থনে সামরিক বিদ্রোহে নেতৃত্ব। এর ১০ বছর পর, দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া শেষে, তিহার জেলে মকবুলের ফাঁসি হয়। কাশ্মীরিদের চোখে মকবুল বাট এখনো একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত।

দুই.

ওপরের আলোচনা থেকে যে জিনিসটা খোলাসা হয় না—তা হলো, কুরেশি ভ্রাতৃদ্বয় কি পাকিস্তানের নির্দেশে গঙ্গা ছিনতাই করেছিলেন, না এর পেছনে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের হাত ছিল? ছিনতাইয়ের কাজে যুক্ত ছিলেন দুই কুরেশি, অথচ ভারতীয় এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হলো একমাত্র হাশিমকে। তা-ই বা কেন? জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর হাশিম ও আশরাফ উভয়েই পাকিস্তানেই ছিলেন। হাশিম পরে ইউরোপে চলে গেলেও আশরাফ আমৃত্যু সে দেশেই বসবাস করেন। যদি ভারতীয় এজেন্টই হবেন, তাহলে মুক্ত অবস্থায় কীভাবে পাকিস্তানে তাঁদের অবাধ বিচরণ সম্ভব? কিছুটা দ্বন্দ্ব মকবুল বাটকে নিয়েও। তিনি একজন কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত। পাকিস্তান থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের অপরাধে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহে নেতৃত্বদানের কারণে তাঁকে ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ফাঁসি দেয়। কুরেশি ভ্রাতৃদ্বয় তাঁর সাহায্য ও সমর্থনেই গঙ্গা বিমানটি উড়িয়ে দেন। তাহলে মকবুল বাটকে কেন বেকসুর ছেড়ে দেওয়া হলো?

এসব প্রশ্নের কোনোটার উত্তর খুব স্পষ্ট নয়। ভারত সরকারিভাবে বরাবর এই হাইজ্যাক ও বিমান জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনাটি পাকিস্তানি সেনা ও গোয়েন্দা বাহিনীর কারসাজি হিসেবে দাবি করে এসেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট সহকর্মী হিসেবে পরিচিত পি এন ধর ঠাট্টা করে লিখেছেন, 'দুই দিন আগে ভুট্টো

যাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গলাগলি করে প্রশংসা করেছেন, যুদ্ধে পরাজয়ের পর সেই তারাই ভারতীয় এজেন্ট বনে গেল! ব্যাপারটা খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

সাম্প্রতিক সময়ে অবশ্য বেসরকারিভাবে ভারতীয়রা বলাবলি শুরু করেছে, পুরো ব্যাপারটার পেছনে ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ 'র'-এর হাত ছিল। একাধিক প্রাক্তন 'র' কর্মকর্তা তাঁদের স্মৃতিকথায় সে কথার সমর্থন করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের বলার সুরটি হলো, 'কেমন ঘোলই না আমরা পাকিস্তানকে খাইয়েছিলাম।' তাদের কথায় অবশ্য কোনোভাবেই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় না, কুরেশি ভ্রাতৃদ্বয় ভারতীয় 'ডবল' এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিলেন, অথবা পুরো পরিকল্পনাটির পেছনে 'র'-এর হাত ছিল। খ্যাতিমান পাকিস্তানি ভাষ্যকার খালিদ হাসান এই নিয়ে যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন দুই মার্কিন গবেষক সিসন ও রোজ।

এসব বক্তব্য ভেঙে দেখা যাক।

ব্রিটিশ গবেষক এলিস্টার ল্যাম্ব বিভিন্ন সূত্রের সাহায্যে এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে হাশিম কুরেশি একজন প্রকৃত কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধা, যিনি প্রথমে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেন এবং পরে ভারতের গোয়েন্দাদের সঙ্গে হাত মেলান। এ কথার প্রমাণ হিসেবে তিনি লাহোরে গঙ্গা অবতরণের পর সেখানকার পুলিশ যে প্রতিবেদন নথিবদ্ধ করে, তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ল্যাম্ব জানাচ্ছেন, পাকিস্তানি পুলিশ শুরু থেকে সন্দেহ করেছিল, পুরো ব্যাপারটা সাজানো। যে অস্ত্র হাইজ্যাকারদ্বয় বহন করছিলেন, তা ছিল নকল। বিমানে যারা যাত্রী হিসেবে বসে ছিল, তাদের প্রায় সবাই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য অথবা তাদের পরিবারের সদস্য। যে বিমানটি হাইজ্যাক করা হয়, সেটি অতিপুরোনো, রীতিমতো লক্কড়ঝক্কড়। ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ সম্ভবত এই বিমান জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, এই পরিকল্পনা করেই গঙ্গাকে নির্বাচন করেছিল। ল্যাম্ব আরও জানান, পাঞ্জাবের চিফ সেক্রেটারিকে বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা জানালে তিনি ছিনতাইকারী দুজনের সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত অস্বীকার করেন।

ল্যাম্বের বর্ণনা এ পর্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ, কিন্তু এর পরের বিষয়টি কিছুটা ধোঁয়াটে। তিনি জানাচ্ছেন, গঙ্গা অবতরণের পরপরই হাশিম ও আশরাফের সঙ্গে দেখা করতে আসেন ফারুক হায়দার ও মকবুল বাট। তাঁরা দুজনেই নিশ্চিত করেন, হাশিম ও আশরাফকে তাঁরা চেনেন। বাট ও হায়দার দুজনেই পাকিস্তানি সেনা ও গোয়েন্দা কর্তাদের কাছে সুপরিচিত, পাকিস্তানি উদ্যোগে যে কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট গড়ে তোলা হয়, তাঁরা দুজনেই তার প্রথম সারির নেতা।

ল্যাম্বের তথ্যানুসারে, লাহোর পুলিশের দাবি, হাশিম কুরেশি একসময় কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের কার্যকর সদস্য ছিলেন। ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের বাসিন্দা হাশিম ১৯৬৯ সালে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেন এবং মকবুল বাটের লিবারেশন ফ্রন্টে যোগ দেন। এক বছর পর কাশ্মীরে ফিরে যাওয়ার সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর

হাতে তিনি ধরা পড়েন এবং একজন ভারতীয় চর হিসেবে কাজ করতে সম্মত হন। ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে ভারতীয় গোয়েন্দারা রাজনৈতিক চাল হিসেবে গঙ্গা হাইজ্যাকের পরিকল্পনা আঁটে এবং হাশিমকে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়। একা সম্ভব নয়, সে জন্য হাশিম তাঁর চাচাতো ভাই আশরাফকেও এই কাজে সম্পৃক্ত করেন। আশরাফের নিজের দাবি, এর পেছনে কোনো রকম ভারতীয় হাত রয়েছে, তিনি জানতেন না। তাঁদের দুজনকে জানানো হয়েছিল, লাহোরে নামার পর তাঁদের সঙ্গে মকবুল বাট ও ফারুক হায়দার যোগাযোগ করবেন এবং পরবর্তী নির্দেশ জানাবেন। ল্যাম্ব উল্লেখ করেছেন, এত বিস্তৃত বিবরণ প্রদান সত্ত্বেও লাহোর পুলিশ তাদের নথিতে এ কথা কোথাও বলেনি যে এই দুই ব্যক্তি ভারতীয় চর। তাদের ধারণা, সম্ভবত নিজেদের অজ্ঞাতেই তাঁরা ভারতীয় চালাকিতে পা দিয়েছেন। কাশ্মীরের স্বাধীনতায় সাহায্য হবে, এই বোধে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা এই কাজে যুক্ত হয়েছিলেন।[১৬]

ভারতীয় গবেষক বি এল শর্মা এই যুক্তির প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলছেন, হাইজ্যাকার দুজন লাহোরে নামামাত্রই তাঁদের রাজকীয় সম্মান দেখানো হয়, তাঁরা তখন খুশি। উঠেছেন-নেমেছেন, মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলেছেন। সে সময় পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন চলছে। তাঁরা কি এতটাই নির্বোধ যে দুজন ভারতীয় চরকে দেখামাত্রই কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধা বলে বুকে জড়িয়ে ধরবেন?

আরেক ভারতীয় গবেষক ও সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা ব্রিজ মোহন সিনহা তাঁর *দ্য সাম্বা স্পাইং কেস* (ভিকাস পাবলিশিং হাউস, দিল্লি, ২০০০) বইয়ে অবশ্য ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর দাবি, ভারতীয় বিমান ছিনতাই করার পরিকল্পনাটি আসলে পাকিস্তানের, তবে তাদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে পরিকল্পনাটি ছিনতাই করে নেয় ভারত। সিনহা জানাচ্ছেন, হাশিম কুরেশি যে একজন ভারতীয় এজেন্ট, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতীয় গোয়েন্দারাই তাঁকে ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান পাঠিয়েছিল। লক্ষ্য ছিল মকবুল বাটের ওপর নজর রাখা। পাকিস্তানে আসার পর তাঁর ওপর ভর করে পাকিস্তানি গোয়েন্দা দপ্তর। মকবুল বাটের সমর্থনে পাকিস্তানিরা তাঁর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। তারা যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, কাশ্মীরি প্রশ্নটি আন্তর্জাতিকভাবে নজরে আনতে তারা একটি ভারতীয় বিমান হাইজ্যাক করবে। আর বিমানটি হবে ভারতীয় এয়ারলাইনসের একটি বিমান, যার পাইলট হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে রাজীব গান্ধী। এই পরিকল্পনা ভেস্তে যায় যখন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আসার পর হাশিম ধরা পড়েন এবং ভারতের হয়ে কাজ করতে রাজি হন। হাশিম ধরা পড়েছিলেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফের হাতে। এই বাহিনীর প্রধান কে এফ রুস্তমজি প্রথম প্রস্তাব করেন, হাশিম বিমান ছিনতাই করবেন, তবে পাকিস্তানি নয়, ভারতীয় চর হিসেবে।

এই গল্পেরও কোনো নির্ভরযোগ্য সত্যায়ন পাওয়া সম্ভব নয়।

পাকিস্তানি সাংবাদিক খালিদ হাসান, যিনি লাহোরে গঙ্গা অবতরণের পর সেই বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন, পুরো ঘটনার একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হাশিমকে বিমানটি হাইজ্যাক করতে ভারত প্রশিক্ষিত করেছে, সিনহার এই দাবি ডাহা মিথ্যা উল্লেখ করে খালিদ হাসান বলেছেন, বিমান হাইজ্যাক করতে কারও আবার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়? এ জন্য তো বড়জোর খান দুই বন্দুক সঙ্গে রাখলেই চলে। ভারত কাশ্মীরি লিবারেশন ফ্রন্টের ওপর নজরদারি করতে ১৮ বছরের এক যুবককে পাঠিয়েছে, খালিদ হাসান মনে করেন, সিনহার এই দাবিও ডাহা মিথ্যা। সে সময় লিবারেশন ফ্রন্টের মোট সদস্যসংখ্যা এক আঙুলে গোনা যেত, এই কজনের ভয়ে ভারত ভীত ছিল, এ কথা ভাবার কোনো কারণ নেই।

খালিদ হাসানের প্রদত্ত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো, হাইজ্যাকারদ্বয় নয়, পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারাই বিমানটি উড়িয়ে দেন। সে সময় পাকিস্তানি পররাষ্ট্র দপ্তরের ইন্ডিয়া ডেস্কের প্রধান, খালিদ হাসানের জ্ঞাতি ভাই কে এইচ খুরশিদ, যিনি ১৯৭২ সালে গঙ্গা হাইজ্যাক মামলায় সাক্ষী ছিলেন, তিনি নিশ্চিত করেছেন, হাইজ্যাকার দুজন নয়, পাকিস্তান সেনাসদস্যরাই বিমানটি অবিলম্বে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। খুরশিদ জানিয়েছেন, তাঁরই সামনে একজন পাকিস্তানি পুলিশ কর্মকর্তা হাশিমের দিকে তাকিয়ে সানুনয় অনুরোধ করেছিলেন, 'খুদা কি লিয়ে হামারি জান ছোড় দো, জাহাজকো উড়া দো।' অর্থাৎ বিমানটি উড়িয়ে দেওয়ার জন্য স্থানীয় পুলিশের ওপর উচ্চতর কোনোখান থেকে চাপ ছিল। খালিদ আরও জানান, কয়েক বছর আগে লন্ডনে খুরশিদ তাঁকে সরাসরি জানান, বিমান উড়িয়ে দেওয়ার পুরো পরিকল্পনাটি ছিল পাকিস্তানি সেনা গোয়েন্দা দপ্তর আইএসআইয়ের।

পাকিস্তানি ভাষ্যকারেরা বরাবর বলে এসেছেন, ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানি বিমান চলাচল বন্ধের একটি কারণ তার দরকার ছিল, সে জন্যই প্রথমে বিমানটি হাইজ্যাক করা হয় এবং তারপর তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। খালিদ হাসান প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতের লক্ষ্য যদি পাকিস্তানি বিমান চলাচল বন্ধ করা হয়, তাহলে নিজের বিমান তাকে উড়িয়ে দিতে হবে কেন? যেকোনো অজুহাতেই তারা সে কাজ করতে পারত। তা ছাড়া বিমানটি ভারতীয়রা নয়, পাকিস্তানি তত্ত্বাবধানে উড়িয়ে দেওয়া হয়, এ নিয়ে তো কোনো সংশয় নেই। পাকিস্তানি যুক্তি মানলে তো বলতে হয়, পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারাও ভারতের হয়েই কাজটি করেছিলেন!

একাত্তরের যুদ্ধে সামরিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে ভারত এই বিমান হাইজ্যাক করে, পাকিস্তানি এই যুক্তিও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। এই বিমান যখন হাইজ্যাক করা হয়, তার পরিকল্পনা নির্ঘাত ১৯৭১ সালের জানুয়ারি নয়, তার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে বা ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে সামরিক অভিযান শুরুর পরিকল্পনা করেছেন, এ কথা

ভাবার কোনো প্রামাণিক কারণ নেই। পাকিস্তানের পূর্ব বা পশ্চিম অংশে তাদের লড়াই করার চিন্তা ভারতীয়দের মাথায় থেকে থাকলে তার জন্য তো সামরিক প্রস্তুতি চাই। কিন্তু তেমন প্রস্তুতির কোনো প্রমাণ কোনো পক্ষ থেকেই উপস্থিত করা হয়নি। সোজা কথায়, ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানি বিমান চলাচল বন্ধের গোপন আয়োজন শুরুর কোনো বাস্তবসম্মত কারণ ছিল, এ কথা মনে হয় না।

সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন সম্ভাবনার কথা লিখেছেন দুই মার্কিন গবেষক রিচার্ড সিসন ও লিও রোজ। তাঁদের ধারণা, কাজটি পাকিস্তানি গোয়েন্দা দপ্তরের, তারাই কাশ্মীরি যুবক দুটিকে দিয়ে এই কাজ করায়, এ জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে আগাম কথাবার্তা বলার প্রয়োজন তারা দেখেনি। ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরা জানাচ্ছেন, এ কাজে সেনা গোয়েন্দা দপ্তরের (আইএসআই) প্রধান জেনারেল আকবর খান স্বপ্রণোদিত হয়ে উদ্যোগটি গ্রহণ করেন। পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের প্রতিনিধি হিসেবে এই গোয়েন্দা দপ্তরও সম্ভবত ভুট্টোর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছিল। সিসন ও রোজ বলছেন, ভুট্টো যেভাবে সম্ভব শেখ মুজিবের হাতে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর ঠেকাতে বা বিলম্বিত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। জানুয়ারির দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এই প্রশ্নে শেখ মুজিব ও তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে এই নিয়ে দর-কষাকষি শুরু হয়েছে। ঠিক সেই সময় হাইজ্যাকের ঘটনাটি এই আলাপ-আলোচনায় বড় রকমের বাধা হয়ে উঠতে পারে, এমন হিসাব সেনা কর্মকর্তা ও গোয়েন্দা নেতাদের থেকে থাকতে পারে।

তাঁদের এই অনুমানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নিজের বক্তব্যের মিল রয়েছে। পাকিস্তানের সবাই যখন হাইজ্যাকারদ্বয়কে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরের সম্মান জানাচ্ছে, বঙ্গবন্ধু সে সময় এটিকে একটি চক্রান্ত হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। একে 'স্যাবোটাজ' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

আরও একটি ভিন্ন হিসাবের কথা সিসন ও রোজ জানিয়েছেন। জানুয়ারি থেকে মার্চ—এই সময়কালে ইন্দিরা সরকার আসন্ন নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে (পূর্ব) পাকিস্তানের ঘটনাবলির দিকে পর্যাপ্ত নজর দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ২৫ মার্চের আগে সরকারি নথিপত্রে পাকিস্তানের ঘটনাবলির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা যেমন অগভীর, তেমনি অপ্রাসঙ্গিক। ফলে হাইজ্যাকারের কোনো পরিকল্পনা যদি কোনো মহলে হয়েও থাকে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সে বিষয়ে আদৌ অবহিত ছিলেন না।

হাইজ্যাকারদ্বয় যে ভারতীয় চর হিসেবে অভিযুক্ত হওয়ার পরও পাকিস্তানে রয়ে যান, সে কথাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। 'কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়া তাঁদের ইচ্ছেমতো হাইজ্যাকারদ্বয় যেভাবে দেশের ভেতরে ঘোরাফেরা করতেন, তাতে তাঁরা যে ভারতীয় চর, সে কথায় আদৌ বিশ্বাস জন্মে না।'[১৭]

হাশিম কুরেশি নিজে পরে ভারতে ফিরে এসে পুরো ঘটনার নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ওয়েবসাইট রেডিফের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে কুরেশি জানান, ১৯৬৯ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি ভারতীয় পাসপোর্ট নিয়ে পাকিস্তানে বেড়াতে আসেন। সেখানে তাঁর মকবুল বাটের সঙ্গে আলাপ হয়, তাঁর কাছ থেকেই তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ পান। ১৯৭০ সালে করাচিতে ইরিত্রিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীরা একটি ইথিওপীয় বিমানের ওপর হামলা চালিয়ে সাড়া ফেলে দেয়। হাশিম জানিয়েছেন, সে ঘটনার পরই মকবুল বাট একই কায়দায় একটি ভারতীয় বিমান ছিনতাইয়ের প্রস্তাব দেন। উদ্দেশ্য, কাশ্মীরিদের আন্দোলনের বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। হাশিমকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এই ছিনতাইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার।

বিমান ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে হাশিম ভারতে ফিরে আসেন, কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করার পরই তিনি ধরা পড়ে যান। হাশিম ভারতীয় গোয়েন্দাদের জানান, তিনি মকবুলের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, আরও দুজন তাঁর সঙ্গে ভারতে এসেছেন। সেই দুজনকে দেখিয়ে দেওয়ার শর্তে হাশিমকে ভারতীয় পুলিশে চাকরি দেওয়া। সেই চাকরি করতে করতেই চাচাতো ভাই আশরাফকে নিয়ে তিনি গঙ্গা বিমানটি ছিনতাই করেন। হাশিম জোর দিয়ে বলেন, তিনি ভারত বা পাকিস্তানের এজেন্ট নন, তিনি একজন সাচ্চা কাশ্মীরি।

হাশিমের বক্তব্য সত্ত্বেও এই হাইজ্যাক ঘিরে যে ধোঁয়াটে ভাব, তা মোটেই মিলল না। একজন অনভিজ্ঞ ১৬-১৭ বছরের কিশোরের হাতে বিমান হাইজ্যাকের যে ভার মকবুল বাট দিয়েছেন বলে দাবি করা হয়, তা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তিনি বিমান হাইজ্যাকের পরিকল্পনা নিয়ে ভারতে এসেছেন, এ কথা জানা সত্ত্বেও হাশিমকে পুলিশে চাকরি দেওয়া হয়। সেই হাইজ্যাক তিনি করলেন, তা-ও ভারতীয় পুলিশে চাকরি করতে করতে, কিন্তু কেউ এ বিষয়ে কিছু জানবে না, অতটা কাঁচা ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ, তা ভাবার কোনো কারণ নেই।

বস্তুত, এ কথা ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, হাশিম কুরেশি আগাগোড়া ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। দীর্ঘদিন ইউরোপে অবস্থানের পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন, ফিরে আসার আগে এ বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সবুজ সংকেত তিনি পেয়েছেন, তা ভাবারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ভারতে ফিরে এলে তাঁকে আটক করা হয় বটে, কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে সদাচরণই করে। কাশ্মীরি কর্তৃপক্ষ দেশে ফেরার পর তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা করে, কিন্তু দুর্বল স্বাস্থ্যের যুক্তিতে তাঁর কারাবাস স্থগিত রাখা হয়।

ইউরোপে থাকার সময় হাশিম কাশ্মীরে শান্তিপূর্ণ মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে জম্মু কাশ্মীর ডেমোক্রেটিক লিবারেশন পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন। এই দলের লক্ষ্য কাশ্মীরের স্বাধীনতা, ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো রকম

সম্পৃক্ততা নয়। লক্ষণীয় যে ভারত সরকার তাঁকে বা তাঁর দলকে এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোনো রকম বাধার সৃষ্টি করেনি। বরং উল্টো, অনেক সময় এমন বোধ হয় যে ভারত সরকার হাশিমকে আগলে রেখেছে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জুনায়েদ কুরেশি একাধিকবার ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে কাশ্মীর প্রশ্নে বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। যাঁরা পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করেন, জুনায়েদের উপস্থিতির প্রতিবাদ করে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে তাঁরা একাধিক চিঠিও লিখেছেন। এ কথা প্রমাণ করে, হাশিম কুরেশি—নিদেনপক্ষে তাঁর পুত্র—ভারতের পক্ষেই কাজ করছেন।

গঙ্গা ছিনতাইয়ের ৪৭ বছর কেটে গেছে। এই ঘটনার পেছনে যে রহস্য, তা এখনো সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত না হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এর একটি ইতিবাচক ভূমিকা ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিয়াজি ও পাকিস্তানি অন্য সামরিক কমান্ডারদের বক্তব্যে সে কথার প্রমাণ রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে এ-ও ছিল আরেক যুদ্ধ!

তথ্যসূত্র

১. আরিফ জামাল, *শ্যাডো ওয়ার*, মেলভিল হাউস পাবলিশিং, নিউইয়র্ক ২০০৯, পৃ : ৯৪
২. *ইত্তেফাক*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
৩. আইয়ুব খান, *ডায়েরিস অফ ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৪৪৮
৪. *ইত্তেফাক*, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
৫. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৯, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪৮
৬. *ইত্তেফাক*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
৭. *ডন*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
৮. উদ্ধৃত : এলিস্টার ল্যাম্ব, কাশ্মীর, *অ্যা ডিসপিউটেড লিগেসি*, রক্সফোর্ড বুকস, ১৯৯১, পৃ. ৩০২
৯. আইয়ুব খান, পৃ. ৪৪৯
১০. আইয়ুব খান, পৃ. ৪৪৯
১১. রাও ফরমান আলী, *বাংলাদেশের জন্ম*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫০
১২. দেখুন : ফজল মুকিম খান, *পাকিস্তান'স ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ*, ন্যাশনাল বুক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৩, পৃ. ৪৭
১৩. রাও ফরমান আলী খান, পৃ. ৫০
১৪. দেখুন : এ এ কে নিয়াজি, *দ্য বিট্রায়াল অব ইস্ট পাকিস্তান*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৫১-৫৩
১৫. ১৯৭১ যুদ্ধ, পাকিস্তান আর্মি পোর্টাল, দেখুন : https://www.pakistanarmy.gov.pk/AWPReview/TextContentf0d8.html?pId=197&rnd=446
১৬. বিস্তারিত দেখুন : এলিস্টার ল্যাম্ব, পৃ. ৩০৪-৩০৫
১৭. বিস্তারিত দেখুন : রিচার্ড সিসন ও লিও ই রোজ, *ওয়ার অ্যান্ড সিসেশন*, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৯০, পৃ. ১৩৫-১৩৭

কচুরিপানা ১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক অনুষঙ্গ

বাশার খান

ভূমিকা

কচুরিপানা বাংলাদেশে আগাছা হিসেবেই পরিচিত। কচুরিপানা চেনে না—গ্রামে এমন মানুষ পাওয়া দায়। বর্তমানে যারা শহরে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু শৈশব কেটেছে গ্রামে, তাদের ছোটবেলার নানা স্মৃতিতে জড়িয়ে আছে এই আগাছা।

বাংলাপিডিয়ায় প্রদত্ত তথ্যানুসারে, 'কচুরিপানা' [Water Hyacinth] এক প্রকার ভাসমান জলজ উদ্ভিদ। মাঝেমধ্যে অধিক পরিমাণে জন্মায় এবং নদীনালা ভরে তুলে নৌ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। এটি অবাধ ভাসমান গুল্ম, নিচে থেকে এক থোকা লম্বা গুচ্ছমূল, ওপরে খর্বিত কাণ্ডে এক থোকা পাতা। পাতার বোঁটা খাটো ও স্পঞ্জি। মঞ্জরি ১৫-২০ সেন্টিমিটার লম্বা, দণ্ডে থাকে ১০-১২টি দৃষ্টিনন্দন ফুল। এটি জন্মায় বদ্ধ জলাশয়ে। বর্ষাকালে এ পানা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং প্লাবনভূমিতে ব্যাপকভাবে ছড়ায়। ফুল ফোটে অক্টোবর-জানুয়ারিতে।[১]

দেখতে গাঢ় সবুজ কচুরিপানার ফুল খুবই নানন্দিক। সাদা পাপড়িময় ফুলের মধ্যে বেগুনি ছোপযুক্ত এবং মাঝখানে হলুদ ফোঁটা থাকে। সাদা পাপড়ির স্থলে কোথাও হালকা আকাশি পাপড়িও দেখতে পাওয়া যায়।

কচুরিপানা আগাছা হলেও এর পাতা গরুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কচুরিপানার লম্বা ডগা শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে গ্রামের মানুষ। এটি দ্রুত পচনশীল, তাই স্তূপ করে কচুরিপানা পচিয়ে জৈব সার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। কচুরিপানার স্তূপকে পরিচর্যা করে সেখানে নানা শাকসবজির চাষ করা হয় গ্রামে। এতে ফলন দ্রুত ও ভালো হয়।

গ্রামের নদীনালা, খাল-বিল ও বর্ষাকালে কৃষিজমিতে এখনো কোথাও কম কোথাও বেশি কচুরিপানা দেখা যায়।

এই জলজ উদ্ভিদ কিন্তু ভিনদেশ থেকে এসে বিস্তৃত হয়েছে বাংলাদেশে। উনিশ শতকের শেষার্ধে জনৈক পর্যটক কচুরিপানার অর্কিডসদৃশ ফুলে মুগ্ধ হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিল থেকে এ উদ্ভিদ এ দেশে আনেন। বাংলাদেশে এটি দ্রুত ছড়াতে থাকে। ১৯২০-এর দশকের মধ্যেই দেশের সব জলাশয় কচুরিপানায় ভরে যায়। এতে নদীপথে নৌ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এবং নিচু জমিতে আমন জাতীয় জলিধান ও পাট চাষ কঠিন হয়ে ওঠে। ফলে বাংলার অর্থনীতিতে এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বেঙ্গল জলপথ বিধি, বেঙ্গল পৌরসভা বিধি, বেঙ্গল স্থানীয় সরকার বিধি, বেঙ্গল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন বিধির সহযোগিতা নিয়ে এই কচুরিপানা বিতাড়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে, কিন্তু এতে তেমন সুফল আসেনি। পরে সরকার সর্বসাধারণের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কচুরিপানা উৎখাত শুরু করে। ১৯৩৬ সালে কার্যকর কচুরিপানা বিধি মোতাবেক সবার জন্য তাদের নিজ জমি বা দখলি এলাকায় কচুরিপানা রাখা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং কচুরিপানা উৎখাত অভিযানে সবার যুক্ত হওয়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোতে প্রশাসকদের নিজ নিজ এলাকার কচুরিপানা ধ্বংস কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

মজার বিষয়, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতেও কচুরিপানা উৎখাতের অঙ্গীকার স্থান পায়। ফলে ১৯৩৭ সালে এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হলে কচুরিপানা উৎখাত কর্মসূচি আরও জোরদার করা হয়।

১৯৪৭ সাল নাগাদ কচুরিপানার সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং পরের দশকে দেশের অনেক নদী-নালা আবার নাব্য হয়ে ওঠে। এখনো দেশের অনেক জায়গায়, বিশেষত বিল ও হাওরে কচুরিপানা আছে, কিন্তু তাতে নৌ চলাচল বা চাষাবাদে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। এটি এখন প্রধানত সার হিসেবেই অধিক ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্ষাকালে বন্যা আক্রান্ত অঞ্চলে গবাদিপশুর প্রধান খাদ্যই এই কচুরিপানা। এ ছাড়া হাওর অঞ্চলসংলগ্ন এলাকায় বাঁশ দিয়ে আটকে রেখে পানির আঘাত থেকে ভিটেমাটি রক্ষায় কচুরিপানা ব্যবহৃত হয়।[২]

কচুরিপানা : একাত্তরের অনুষঙ্গ

কচুরিপানা নামের এই আগাছা বাংলার সীমানা থেকে সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টায় নানাভাবে উৎখাতের চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত থেকে গেছে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পেছনে অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সহায়ক অনুষঙ্গগুলোর অন্যতম ছিল এই কচুরিপানা।

অবাক করার মতো ঘটনা হলেও সত্যি যে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা অপারেশন পরিচালনা ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচাতে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে প্রকৃতির এই জলজ উদ্ভিদ। কচুরিপানাভর্তি ডোবায় লুকিয়ে কত নিরীহ বাঙালি নির্ঘাত মৃত্যু থেকে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন—তার পরিসংখ্যান নির্ণয় করা দুরূহ। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও নথিপত্র ঘেঁটে এবং মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অনেকের স্মৃতিচারণায় এই কচুরিপানার অবদানের দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

কচুরিপানা ও দুঃখী সেই মেয়েটি

গবেষক ও সাংবাদিক আফসান চৌধুরী হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের *স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* থেকে শুরু করে দীর্ঘদিন যাবৎ মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহে কাজ করছেন। প্রকাশ করেছেন বেশ কয়েকটি অনবদ্য গ্রন্থ। আফসান চৌধুরীর একটি লেখায় কচুরিপানার মাধ্যমে শরণার্থীদের নদী পাড়ি দেওয়ার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায়। একই সঙ্গে ঘটনাটি হৃদয়বিদারকও। তিনি লেখেন—

> ...একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই, যেটি [মুক্তিযুদ্ধে] আমাদের সাধারণ মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেবে। কুমিল্লার একটি নদী পার হচ্ছিল একদল হিন্দু শরণার্থী। নৌকা না পেয়ে তারা কচুরিপানা সংগ্রহ করে একে ভেলা হিসেবে ধরে ধরে পার হচ্ছিল হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে। ওই দলের মধ্যে একজন মা ছিলেন, সঙ্গে ছিল ছোট্ট শিশু। যেহেতু অনেক মানুষ কচুরিপানার ভেলাটি ধরেছিল, তাই পানির নিচে চলে গিয়েছিল। মহিলাটি এই অবস্থা দেখে চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে থাকেন। এক হাতে তাঁর সন্তান, অন্য হাতে ভেলাটি ধরা। এই অবস্থায় নড়াচড়া, চিৎকার সবাইকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দেয়। আশঙ্কা ছিল, আওয়াজ শুনে পাকিস্তানি আর্মি বা রাজাকাররা চলে আসতে পারে। ওই মহিলার পাশে ১৪-১৫ বছরের একটি মেয়ে ছিল। ওই মেয়েটি মহিলাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু মহিলার কিছুতেই ভয় কাটছিল না। তখন ওই মেয়েটি ভার কমানোর জন্য নিজের হাত ছেড়ে দিয়ে পানির নিচে তলিয়ে যায়। ভেলার সবাই নিরাপদে পৌঁছেছিল, শুধু সেই মেয়েটি ছাড়া।
>
> এ রকম অসংখ্য ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ঘটেছে। কিন্তু তার কোনো উল্লেখ নেই, স্বীকৃতি নেই, মানুষের মধ্যে চর্চা নেই। আমরা যত দিন এই মেয়েটিকে আমাদের শ্রেষ্ঠতম মানুষের একজন বলে সম্মান দিতে না পারব, যত দিন তাকে মুক্তিযোদ্ধা বলে স্বীকৃতি দিতে না পারব, তত দিন পর্যন্ত নারীর ইতিহাস বা সমাজের ইতিহাস উপেক্ষিতই থেকে যাবে। সম্ভবত উপেক্ষার মেঘ কেটে কখনোই সূর্য হাসবে না আমাদের ইতিহাসের সোনালি আকাশে।[৩]

চারটি প্রাণ বাঁচানোর গল্প

বর্তমানে কলকাতায় স্থায়ী অধ্যাপক ডা. শিশির কুমার মজুমদারসহ তাঁর চার ভাই কচুরিপানার কারণে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও এদেশীয় দোসর রাজাকারদের

নির্ঘাত গণহত্যা থেকে রক্ষা পান। ১৯৭১ সালের ২০ জুন (বাংলা ৫ আষাঢ় ১৩৭৮) রোববার সকাল ৯টার পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বাগেরহাট, খুলনা, পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জের ইউনিট এবং তাদের এদেশীয় দোসর ও কুখ্যাত রাজাকার রজ্জব আলী ফকিরের দল মিলে একযোগে হামলা চালায় বর্তমান বাগেরহাট জেলার চিতলমারীর 'দশমহল'-এর অন্তর্গত খলিশাখালী ও খড়মখালী এলাকায়। নদী-খাল ও ডোবা-নালাবাহিত দশমহল মুক্তাঞ্চল ছিল। এ কারণে এ অঞ্চলে প্রচুর লোক আশ্রয় নেয় সে সময়। আবার বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলের অনেক শরণার্থী ভারতে যাওয়ার পথে দশমহলে অবস্থান করছিল সেদিন। এমন সময়ই অতর্কিত হামলা করে হানাদার বাহিনী ও এদেশীয় দোসর রাজাকাররা। শিশির কুমার মজুমদার বরিশাল থেকে যশোর হয়ে কলকাতা যাওয়ার পথে দশমহলেই অবস্থান করছিলেন সেদিন। স্মৃতিচারণায় তিনি লেখেন—

> ...সকালবেলা বড় খাল ধরে মিলিটারি পাঁচখানা স্পিডবোট ফটফট আওয়াজ তুলে আচমকা ঢুকে পড়ল দশমহল অঞ্চলে। প্রথমেই খানসেনারা রাইফেল হাতে ঢুকে পড়ল নগেন মজুমদারের বাড়িতে। শুরু হয়ে গেল বেপরোয়া গোলাগুলি। সেই সঙ্গে চেঁচামেচি। আমরা এলোমেলোভাবে এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করলাম।...শিলাবৃষ্টির মতো গুলিবৃষ্টিতে ভেঙে পড়া গাছের মতো মানুষ পড়ছে এখানে-সেখানে। ছুটছে মানুষ ঝোপেঝাড়ে জঙ্গলে—যে যেখানে পারছে। পানা পুকুরে ডুব দিচ্ছে। আমরা চার ভাইও আশ্রয় নিলাম কচুরিপানায় ভরা একটা পচা ডোবায়। গলাজল অবধি ডুবে কচুরিপানার জঙ্গলের আড়ালে মাথা লুকালাম। কচুরিপানা যে এত গুরুতর কাজে লাগবে, কে কবে ভেবেছে। কোনো কাজে না লাগা এই আগাছাটি যে এই সময়ে কত মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে, তার কোনো হিসাব নেই।
>
> কিন্তু এই কচুরিপানার মধ্যে লুকিয়ে থাকা যেন একটা পরীক্ষা—ধৈর্যের পরীক্ষা, সহনশক্তির পরীক্ষা। গা ঘেঁষে চলাফেরা করছে সাপ-ব্যাঙ। কালো কালো জোঁক আমাদের সারা শরীরে ছেঁকে ধরেছে। তারা রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হচ্ছে। আর আছে মশা। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা। তারা অনবরত নাকে-চোখে-মুখে কামড়ে চলেছে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও একটু নড়াচড়া করা চলবে না।...টের পাচ্ছি কানের কাছ দিয়ে শোঁ শোঁ করে ছুটে যাচ্ছে গুলি। হাজার হাজার মানুষ ছুটছে। ছুটতে ছুটতে লুটিয়ে পড়ছে। আর্তনাদে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হচ্ছে। একসময় আর্তনাদ স্তিমিত হতে বুঝলাম, এবার লুট পর্ব শুরু হয়েছে। প্রচুর লুটের মাল নেওয়ার পর খানসেনারা স্পিডবোটে উঠে চলে গেল। আরও কিছুক্ষণ ধরে রাজাকার বাহিনীর গুন্ডারা লুটপাট ও অত্যাচার চালানোর পর যখন সব স্তব্ধ হলো, তখন সন্তর্পণে ডোবা থেকে উঠে এলাম। কিন্তু কী দৃশ্য! চারদিকে তাকানো যায় না। যে মানুষগুলোর সঙ্গে এত দিন নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি হয়েছিল, তাদের ছিন্ন ভিন্ন দেহ পড়ে থাকতে দেখে মন বেদনায় অসাড় হয়ে গেল। হাজার হাজার মানুষের মিলনতীর্থ দশমহল এখন এক প্রেতলাঞ্ছিত মহাশ্মশান।[৪]

এই গণহত্যায় শিশির কুমার মজুমদারের পরিচিত অনেকেই নিহত হন। তাঁরা চার ভাই বেঁচে যান কচুরিপানার নিচে মাথা লুকিয়ে। পরে যশোর হয়ে ভারতে যেতে সক্ষম হন তিনি ও তাঁর ভাইয়েরা।

এক কিশোরীর সাক্ষ্য

চিত্রকর কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একাত্তরে ১৩ বছরের কিশোরী। ভারতের ত্রিপুরার রাজবাড়ি ও বল্লা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ, পরে নার্স হিসেবে যোগ দেন ৪ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ফিল্ড হাসপাতালে। সেবা দিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচানোর দায়িত্ব পালন করেন।

ভারতে শরণার্থী হয়ে যাওয়ার সময় পাকিস্তানি আর্মির আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন কয়েকবার। ডোবায় নেমে কচুরিপানায় আশ্রয় নিয়ে শরণার্থীদের প্রাণ বাঁচানোর ঘটনার সাক্ষী তিনিও। সাক্ষাৎকারে তিনি জানান—

> বরিশাল থেকে নানা বিপদসংকুল পথ পেরিয়ে আমাদের শরণার্থী কাফেলাটি মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুরের মেঘনা নদী হয়ে একদিন পৌঁছায় কুমিল্লার দাউদকান্দির কাছে বর্তমান চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার সাচারে। সাচারে ছিল বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির। পাশে ছিল বিশাল রথ। আশপাশে ছোট ছোট বেশ কিছু ঘর ছিল। দু-একজন বাদে এখানকার অধিকাংশ মানুষ এর মধ্যেই ত্রিপুরা আশ্রয় নিয়েছে। দিন-রাত চলতে চলতে আমরা খুবই ক্লান্ত। তখন আমরা মন্দিরের পাশের ঘরগুলোতে এক দিনের জন্য আশ্রয় নিই। হালকা খাওয়াদাওয়া করি। এ সময় একটি ছেলে দৌড়ে এসে বলে, আপনারা শিগগিরই পালান। আর্মি আসছে। পালান পালান।
>
> এরপর সবাই দৌড়ে কেউ একটু দূরে ধানখেতে, কেউ ধানখেতের পাশের ডোবায় কচুরিপানায় আশ্রয় নিই। একসঙ্গে সবাই থাকলে আর্মি দেখে ফেলতে পারে। তাই কিছু লোক ধানখেতে থাকি, বাকিরা ডোবার কচুরিপানায়। ধানগাছগুলো বড় হওয়ায় রক্ষা পাই। বাকিরা ডোবার পানিতে পুরো শরীর ডুবিয়ে মাথার পাশে কচুরিপানা দিয়ে নিশ্বাস নেওয়ার জন্য শুধু নাকটা জাগিয়ে থাকেন। এরপর খেয়াল করে দেখলাম জগন্নাথের রথটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিল। বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণ হলো যেন। কিছুক্ষণ পর আর্মি চলে যায়। আমরা ধানখেত ও ডোবা থেকে উঠে আসি। স্থানীয় লোকেরা বলল, আপাতত আর্মি এখানে আর আসবে না। কারণ তারা তাদের অপারেশন শেষ করে দিয়ে গেলে এবং কোনো বাধার সম্মুখীন না হলে একই জায়গায় আর আসে না। তাই আপনারা এখানে আজকের দিনটা থেকে যেতে পারেন। আমরা সেদিনটা ওখানে থেকে পরদিন ত্রিপুরার উদ্দেশে রওনা হই।[৫]

দুই বীরাঙ্গনার গল্প

কচুরিপানায় ডুবে আশ্রয় নিয়ে গ্রামবাংলার মা-বোনেরাও নিজের প্রাণ ও ইজ্জত বাঁচিয়েছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করত হঠাৎ। তাৎক্ষণিকভাবে নারীদের নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়া অত সহজ ছিল না। তাই তাঁরা বাড়ির পাশের কচুরিপানাভর্তি ডোবা-নালায় নেমে যেতেন। পানিতে পুরো শরীর ডুবিয়ে কচুরিপানায় নাকটা জাগিয়ে প্রাণ বাঁচাতেন। হানাদার বাহিনী চলে গেলে উঠে আসতেন। তারপর ছুটতেন নিরাপদ আশ্রয়ে। অথবা থেকে যেতেন নিজ বাড়িতে। কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার বীরাঙ্গনা আফিয়া বেগম তাঁর স্মৃতিচারণায় জানান—

একাত্তরের উত্তাল সময়। বাড়ির পাশে হাসানপুর রেলস্টেশনে ছিল আর্মি ক্যাম্প। স্থানীয় রাজাকারদের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদাররা জেনে যায় আমার কথা। তখন আমার বয়স ১৭ বছর। বিয়ে হয়নি। ২-১ দিন পরপর আমাকে খুঁজতে বাড়িতে হানা দিত তারা।

যেহেতু বাড়ির কাছেই আর্মি ক্যাম্প, তাই তাদের আসার খবর পেয়েই আমি লুকিয়ে থাকতাম। ভাবতাম, একজন নারীর জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তাঁর সতীত্ব। এই সতীত্ব বাঁচানোর জন্য কখনো আমগাছের ডালে, কখনো পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে, কখনো বা ঘরের ভেতর আশ্রয় নিয়ে লুকিয়ে থেকেছি। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।[৬]

কচুরিপানায় লুকিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছেন আফিয়া বেগম। সর্বক্ষণ কচুরিপানায় অবস্থান করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একটা সময় তাঁকে উঠে আসতে হয় শুকনো জায়গায়। কুচুরিপানায় আত্মরক্ষা হলেও ডাঙায় এসে ধরা পড়ে যান আফিয়া বেগম। এরপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন।

ময়মনসিংহের বীরাঙ্গনা রাজিয়া খাতুন কমলাকে স্থানীয় এক রাজাকার প্রতারণার ফাঁদে ফেলে তাঁকে পাকিস্তানি আর্মির হাতে তুলে দিয়েছিল। তাঁর পৈতৃক ঠিকানা অবশ্য কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে। বর্তমান আবাস ময়মনসিংহে। একাত্তরে কমলা ছিলেন কিশোরী। এই অল্প বয়সী কিশোরীর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায় হানাদার বাহিনীর একাধিক সদস্য। শত নির্যাতনের পরও পাকিস্তানি আর্মির নির্যাতন ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজতেন কমলা। কচুরিপানায় লুকিয়ে ও তাতে নাক জাগিয়ে একদিন পালাতেও সক্ষম হন তিনি। সেই দুঃসহ দিনের স্মৃতিচারণায় তিনি বলেন—

...একদিন পাকিস্তানি আর্মি ডিশ ভইরা কাপড় দিয়া কয়, ধো। আমারে কাপড় ধোওয়ায় লাগি দিছে। থানার সামনের পুকুরে যাই কাপড় ধুইতে। আমারে যে রাজাকারডা ধইরা আনছিল, সে যায় সেখানে। তখন তার সঙ্গে খুব ভাইল [ভালো সম্পর্কের ভান করা] দিলাম। হেয় আমারে কয়, আর্মি আরও খারাপ কাজ করব, আমার লগে লও, যাইগা। আমিও তার কথায় রাজি হইয়া গেলাম। হের লগে যহন যাওয়া ধরছি, তহন এক পাকিস্তানি কয়, এই দাঁড়া। আরেকটা পাঞ্জাবি তারে ডাক দিয়া থানায় নিছে।...আর্মি রাজাকারডারে লইয়া ব্যস্ত। আমারে তহন আল্লায় বুদ্ধি দিছে। এরপর তিলখেত দিয়া গড়াইয়া যাইতে যাইতে নদীর মধ্যে পইড়া গেছি। বড় একটা কুইচ্চা [কচুরিপানা] দিয়া দিছি মাথায়। এরপর কচুরিপানার ভেতরে ডুইবা গেছি। আমার খালি নাকটা ভাসানো। আর চোখ দিয়া দেখতাছি। আর্মি আমারে খোঁজে, এই দিকে গুলি করে, ওই দিকে গুলি করে। রাজাকারডারে কইতাছে, তুই ভাগায় দিছস। তারেও মারতাছে। কিন্তু আমি পানি নাড়ি না। আল্লাহ আল্লাহ করতাছি। হেরা গুলি করতাছে। পানির মধ্যে পাশেও গুলি পড়তাছে।...পাঞ্জাবিরা ঘণ্টাখানেক গোলাগুলি করল। তারপর গেলগা। এরপর আমি আস্তে আস্তে পানিতে ভেসে ভেসে গেছি। বহুত কষ্টে এক মহিলার বাড়ি গিয়া উঠছি।[৭]

কচুরিপানায় ভর করে আত্মরক্ষা পেয়ে পরে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করেন রাজিয়া খাতুন এবং তাঁদের সঙ্গে সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কাজ করেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নয় মাস অবরুদ্ধ দেশে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র আনা-নেওয়া এবং ছদ্মবেশে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের কাজ করতেন গাজীপুরের কালীগঞ্জের রাবেয়া খাতুন। ১৯৭১ সালে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রাবেয়া, নারীনেত্রী ফোরকানা বেগম এবং তাঁর মা মুক্তিযোদ্ধা রোকেয়া বেগমের সাহচর্য ও অনুপ্রেরণায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। রাবেয়া ও তাঁর সঙ্গীরা ইপিআরের [পরে বিডিআর, বর্তমানে বিজিবি] এক বাঙালি সদস্যের কাছ থেকে গ্রামপর্যায়ে গোয়েন্দাগিরি এবং নিজে নিরাপদ থাকার প্রশিক্ষণ পান।

গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহের জন্য একদিন নদী পার হতে গেলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে যান রাবেয়া। সেদিন বুদ্ধি করে নদীতে নেমে গিয়ে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে হানাদার বাহিনীর দৃষ্টি এড়াতে সক্ষম হন রাবেয়া ও তাঁর সঙ্গীরা।

স্মৃতিচারণায় রাবেয়া খাতুন বলেন—

> বালু নদীর তীরে পুবাইল নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে আমরা বালু নদী পার হতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখি পাকিস্তানি সেনারা আসছে। তখন আমরা নদীর প্যানিতে নেমে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে বসে ছিলাম। এভাবে কয়েক ঘণ্টা পানিতে অপেক্ষা করে হানাদার সেনারা চলে যাওয়ার পর আমরা পানি থেকে উঠে আসি। এরপর জঙ্গল দিয়ে বাড়িতে যেতে সক্ষম হই।[৮]

অপারেশন জ্যাকপট

১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট পরিচালিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের নৌ-কমান্ডো বাহিনীর প্রথম অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট'। এদিন রাতে নৌ-কমান্ডোরা একযোগে মোংলা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ বন্দর আক্রমণ করে এবং পাকিস্তানি বাহিনীর ২৬টি পণ্য ও সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ এবং গানবোট ডুবিয়ে দেয়।

অত্যন্ত গোপনে পরিচালিত হয় অপারেশন জ্যাকপট। এর সফলতা তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। বাঙালি নৌ-কমান্ডোরা এই অপারেশনের মাধ্যমে যুদ্ধের গতি সম্পর্কে বিশ্বকে ধারণা দিতে সক্ষম হন।

১৫ আগস্ট রাতের অপারেশনে ব্যাপক সফলতার পরদিন অর্থাৎ ১৬ আগস্ট রাতে আক্রমণ করা হয় কুমিল্লার দাউদকান্দি ফেরিঘাটে। সেখানে ফেরি, বাজ ও পন্টুন ডুবিয়ে দেন নৌ-কমান্ডোরা। কমান্ডোদের সফলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করতে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে কচুরিপানা—এমনই তথ্য উঠে এসেছে দাউদকান্দি ফেরিঘাটে অপারেশনের কমান্ডার বীর বিক্রম শাহজাহান সিদ্দিকীর

সাক্ষাৎকারে। তিনি জানান—

সে রাতে প্রচুর স্রোত ছিল। প্রায়ই কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছিল। তো আমরা নাকটা জাগিয়ে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে ভেসে যাওয়ার মতোই যাচ্ছিলাম। রাতের অন্ধকারে শত্রু পাহারাদাররা বুঝতেই পারেনি যে কচুরিপানার নিচে মানুষ আছে। এমনি করে টার্গেট পয়েন্টে পৌঁছে যাই। ২০ গজ দূরত্বে এসে ডুবসাঁতার দিয়ে ফেরির কাছে আসি। যেন পাহারাদাররা বুঝতে না পারে। পানির নিচে ফেরির বডিতে যখন আমরা চলে আসি, তখন আমরা নিরাপদ। ফেরির ওপরের লোকজন আমাদের আর দেখছিল না। স্বাভাবিক কারণেই তাদের দৃষ্টি ছিল খানিক দূরে। এরপর শুরু হলো মাইন ফিট করার কাজ। ফেরি বা জাহাজের লোহার বডিতে মাইন সহজে ফিট করার জন্য মাইনের ওপর চুম্বক ছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল যে ফেরি দীর্ঘদিন পানিতে থাকায় নিচে শেওলার আস্তরণ জমে ছিল। শেওলা পরিষ্কারের জন্য আগে থেকেই আমাদের কমান্ডো নাইফ দিয়ে দেওয়া হয়। লম্বা করে শ্বাস নিয়ে ডুব দিয়ে আমরা শেওলা পরিষ্কার করতে থাকি। কয়েকবারে শেওলা পরিষ্কার সম্পন্ন হয়। পাঁচ কেজি ওজনের লিম্পপেড মাইন তো বুকের সঙ্গে বাঁধা। ডুব দিয়ে গিয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে মাইন ফিট করি। মাইন ফিট করতে গিয়ে শব্দ না করার কৌশল আমাদের আগেই রপ্ত ছিল। মাইনের ভেতরে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক। এর ওপর ফুটবল পাম্প করে যে—এ রকম একটা জিনিস থাকে। এখানে একটা ডেটোনেটর। তারপর একটা স্ট্রাইকার। স্ট্রাইকারটা ভেতরে ডেটোনেটরকে আঘাত করলেই বিস্ফোরিত হয়। পানিতে এটা কী করে সম্ভব? স্ট্রাইকারের ওপর পরিমাণমতো কেমিক্যাল সল্ট ছিল। এটা পানিতে আস্তে গলতে থাকে। অনেকটা মোম গলার মতো। ওপরে একটা রাউন্ড ক্যাপ লাগানো। কমান্ডোদের জন্য নির্দেশ হচ্ছে মাইন লাগিয়ে ক্যাপটা খুলে এনে আমাকে দিবা। যাতে বুঝতে পারি যে মাইন ঠিকমতো লাগানো হয়েছে। তো কেমিক্যাল সল্টটা গলে গিয়ে একটা স্পিরিং গিয়ে ডেটোনেটরকে আঘাত করে। তখন মাইন বিস্ফোরিত হয়। মোমের মতো কেমিক্যালটা গলতে ৪০-৪৫ মিনিট লাগে। এরপর মাইন বিস্ফোরিত হয়। এই সিস্টেমটা এ জন্য যে কমান্ডোরা মাইন ফিট করে যাতে নির্ধারিত নিরাপদ জায়গায় যেতে পারে। যুদ্ধের নিয়ম হচ্ছে নিজেদের হতাহতের সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া। তুমি শত্রুকে ধ্বংস করবা এবং নিজেও বাঁচার চেষ্টা করবা, এটাই কৌশল। এ জন্যই এই কেমিক্যাল। তো দাউদকান্দির ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। অন্য নৌ-কমান্ডোরা ছিল সরাসরি নৌবাহিনীর লোক। তাঁরা ফ্রান্সে অবস্থানরত পাকিস্তান নৌজাহাজ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। আমি একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলাম, বেসামরিক নৌ-কমান্ডো। আমাদের বলা হয়েছিল, অপারেশনে নামবা। মাইন ফিট করে স্রোতের অনুকূলে ভাটির দিকে গিয়ে আশ্রয় নিবা। দাউকান্দিতে এসে আমাকে স্পট সিদ্ধান্ত নিতে হয়। স্রোতের অনুকূলে দক্ষিণ দিকে তো দাউদকান্দি ফেরিঘাট। সেখানে হানাদার বাহিনী থাকতে পারে। তারপর এত রাতে একই বয়সের ৮ যুবক সুইমিং কসটিউম পরে হেঁটে যাব। সুইমিং কস্টিউম পরা কমান্ডোকে উলঙ্গের মতোই দেখায়। আমাদের উলঙ্গ দেখে স্থানীয় লোকজন বুঝে বা না-বুঝে হইচই করতে পারে। তাতে তো আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি। এ জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিই, স্রোতের উল্টা দিক, অর্থাৎ চরের দিকেই আমরা আশ্রয়ে যাব। এটাকে সামরিক ভাষায় রেসকিউ পয়েন্ট বলে। আমরা সে রাতে মাইন ফিট করে উল্টো সাঁতার কেটে রেসকিউ পয়েন্টে যাই। তার ৬-৭ মিনিট পর ৯টি মাইন এক এক করে বিস্ফোরিত হতে থাকে। পুরো

দাউদকান্দি কেঁপে ওঠে। লোকজন জেগে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে। পাকিস্তানি বাহিনী তখন সমানে মেশিনগান দিয়ে গুলি করতে থাকে। গুলি করে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিককে টার্গেট করে। তারা মনে করছে, কেউ পশ্চিম বা দক্ষিণ দিক থেকে এসে আক্রমণ করেছে। উত্তর দিকে তো নদী আর চর। কেউ নেই। তারা এদিকে গুলি করেনি। ওই দিকে ওরা সমানে গুলি ছুড়ছে। মর্টারের গোলা মারছে। নদীর পানি ছেড়াবেড়া করে ফেলছে। আমাদের চোখে তৃপ্তি আর আনন্দের হাসি। যুদ্ধে জয়ের আনন্দে বলতে থাকি, মর শালারা মর। আমরা পার হয়ে গেছি। ধরতে পারবি না। মাঝিরা নৌকা বাইছিল। আমরা ৮ জন নৌকার তক্তা তুলে দিয়ে বইঠা বাইতে থাকি। দ্রুতই নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যেতে থাকি। দ্রুতই আরও দুই কিলোমিটার দূরে চলে গেলাম। আমরা যেহেতু যোদ্ধা, তাই জানি কতটুকু দূরে গেলে সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া যায়। তো আমরা সে জায়গায় গিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া জানাই। তখন কি যে শান্তি-আনন্দ লাগছিল, বোঝাতে পারব না। পাকিস্তানি বাহিনী বুঝতেই পারল না, কোন দিক দিয়ে তাদের আক্রমণ করা হয়েছে। এরপর দেখতে পেলাম যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক হয়ে আর্মির জিপ, লরি হেডলাইট জ্বালিয়ে দাউদকান্দি ঘাটের দিকে আসছে। তাদের ধারণা হয়েছে, মুক্তিরা ফেরিঘাট আক্রমণ করেছে। সমানে সৈন্য যাচ্ছে। এরা মনে করেছে ঘাটে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আর এদিকে আমরা যুদ্ধ শেষ করে দিয়ে আসছি। ওরা যাচ্ছে যুদ্ধ করতে। তাদের তৎপরতা দেখে হাসছিলাম আমরা।[৯]

দুই মুক্তিযোদ্ধার বয়ান

গাজীপুরের ভুরুলিয়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী জানান, তাঁদের পরিচালিত একটি অপারেশন সফল করতে সহায়তা নেন কচুরিপানার। তিনি বলেন—

> ...জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে কসবা সীমান্ত দিয়ে আমাদের ১০ জনের একটি গেরিলা গ্রুপ দেশে ঢোকে। গ্রুপের কমান্ডার ছিলেন সেনাসদস্য রাজেন্দ্রপুর এলাকার আবদুল রশিদ। আমি সেকেন্ড ইন কমান্ড। আমাদের প্রত্যেকের কাছে স্টেনগান ছাড়াও প্রচুর বিস্ফোরক (পিকে), বিস্ফোরণ ঘটানোর কাজে ব্যবহৃত টিএনটি যন্ত্র, বুস্টার, কর্ক ও গ্রেনেড ছিল। দেশে প্রবেশ করে হেঁটে জয়দেবপুর আসার সময় রাত কাটানোর জন্য বাঞ্ছারামপুরে অবস্থান নিই। রাতে জানতে পারি, পাকিস্তানিদের একটি লঞ্চ মেঘনা নদী দিয়ে বাঞ্ছারামপুরের দিকে আসছে। খবর পেয়ে প্রস্তুতি নিই। নদীর পানিতে নেমে কলাগাছ ধরে ভেসে কচুরিপানা দিয়ে মাথা ঢেকে অগ্রসর হই। রাত ৮টার দিকে গ্রেনেড চার্জ করি। লঞ্চটিতে আগুন ধরে গেলে এক-দেড় শ পাকিস্তানি বাহিনীর সবাই মারা পড়ে। এটাই ছিল আমাদের প্রথম অপারেশন। তিন দিন পর পৌঁছি জয়দেবপুরে।[১০]

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির যুদ্ধ করেন ২ ও ৩ নম্বর সেক্টরের অধীনে। সালদা নদীতে একটি সফল অপারেশন শেষ করে পেছন থেকে আসা পাকিস্তানি সেনাদের একটি দলের অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়েন তাঁরা। সঙ্গীদের অনেকেই শহীদ হন। কিন্তু কচুরিপানায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বেঁচে যান হুমায়ুন কবির। স্মৃতিচারণায় তিনি জানান—

...ফোর বেঙ্গলে আমি ছিলাম আলফা কোম্পানিতে। কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন সালেক। একবার খবর আসে, পাকিস্তানি সেনারা সালদা নদী দিয়ে নৌকায় ভেতরে ঢুকে আমাদের ওপর আক্রমণ করবে।

হাবিলদার মুছলেম উদ্দিনের নেতৃত্বে আমাদের ১৭ জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তা প্রতিহত করার। দলে জলফু, রফিক আর শাফিল ছিলেন বন্ধুর মতো। বাকিরা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আর্মি। রাতে মার্চ করে মোহন্দবাগ স্টেশন দিয়ে চার কিলোমিটার আগেই আমরা পজিশন নিই, সালদা নদীর চারাজারি নামের জায়গায়। ব্রিটিশ এলএমজি দিয়ে আগে নৌকা ছিদ্র করতে হবে। অতঃপর সেনাদের গুলি করা হবে চায়নিজ এলএমজিতে। এমনটাই ছিল পরিকল্পনা।

নদীর একটু বাঁকে গর্ত খুঁড়ে আমরা পজিশন তৈরি করি। এবার অপেক্ষার পালা। সারা দিন কেটে যায়। কিন্তু শত্রুর নাম-নিশানা নেই। নাওয়া-খাওয়াও বন্ধ। তবু চোখ দুটো স্থির থাকে।

বিকেল তখন পাঁচটা। আমাদের রেঞ্জের ভেতরে ঢুকে পড়ে তিনটি পাটবোঝাই নৌকা। কিন্তু তাতে কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। নৌকার চতুর্দিকে পাট দিয়ে ক্যামোফ্লেজ করা। ভেতরে রয়েছে পাকিস্তানি সেনাদের কমান্ডোরা। আমরা তা না বুঝলেও হাবিলদার মুছলেম উদ্দিনের চোখ এড়ায় না। তিনি শুধু বললেন, 'ফায়ার'। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে আমাদের অস্ত্রগুলো। তখনই নৌকায় পাটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে কমান্ডোরা। আমাদের গুলিতে তারা রক্তাক্ত হয়। এমন আক্রমণ তারা স্বপ্নেও চিন্তা করেনি। গুলিতে প্রাণ হারায় তিনটি নৌকার সব কমান্ডো। আমরা তখন উল্লাস করি 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলে।

কিন্তু তখনো পেছনে আরও দুটি নৌকা ছিল। ফায়ারের শব্দ পেয়ে ওরা সেখানেই হোল্ড করে। পেছন থেকে আমাদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয় তারা। আমরা তা টেরই পাই না। সন্ধ্যার পর চারদিকে অন্ধকার নামে। ব্যাক করব। ইন-দ্য-মিনটাইম বেরি লাইট পিস্তলের আলোয় আলোকিত হয় চারপাশ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা আমাদের মুখোমুখি হয়ে বেয়নেট চার্জ করতে থাকে।

'মাদারচোদ' বলে প্রথমে শাফিলের পেটে বেয়নেট ঢুকিয়ে দেয়। অতঃপর অন্যদেরও। আর্মস ফেলে আমি কচুরিপানাভর্তি একটি গর্তে ঝাঁপ দিই। আমার ওপর এসে পড়ে এক আনসারও। তার হাতে গুলি লেগে গর্তের পানি লাল হয়ে যায়। ওখানেই মরার মতো পড়ে রইলাম। মৃত ভেবে পাকিস্তানি সেনারা চলে যেতেই প্রাণে বাঁচি। ১৭ জনের মধ্যে ওই দিন ১৪ জনই শহীদ হন। জলফু মিয়াসহ আমরা তিনজন বেঁচে যাই দৈবক্রমে। এভাবে এক একটি অপারেশনে আমরা মরণের স্বাদ নিতাম।[১১]

৪ নম্বর সেক্টর কমান্ডারের বয়ান

মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল চিত্তরঞ্জন দত্ত [সি আর দত্ত নামে পরিচিত] ছিলেন ৪ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার। ৪ নম্বর সেক্টরের ভৌগোলিক সীমানা ছিল সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল এবং খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন বাদে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক পর্যন্ত বিস্তৃত। পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনা ও আত্মরক্ষায় তাঁর নেতৃত্বাধীন বাহিনীও কচুরিপানাকে ব্যবহার করার তথ্য দিয়েছেন

সি আর দত্ত নিজেই। সাদামাল নদীতে অপারেশন চালাতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট একটি দল। কচুরিপানা দিয়ে মাথা ঢেকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে ফেরেন মুক্তিযোদ্ধারা। সি আর দত্ত জানান—

> ...নায়েক কুতুব ছিল আমার সেক্টরের একজন বীর যোদ্ধা। আজ সে আমাদের মধ্যে নেই। তার সাহসিকতার একটি ঘটনা বলা যাক। তখন সিলেটের সাদামাল নদীতে বেশ পানি। ফেরির সাহায্যে নদী পার হতে হয়। কিন্তু ফেরিটি ছিল পাকিস্তানিদের কবজায়। নায়েক কুতুবকে ফেরিটি ধ্বংস করে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হলো। ওর সঙ্গে দুজন সিপাহি ও দুজন ছাত্র সহযোগী। সেদিন সাদামালে বেশ স্রোত। কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছিল বেশ দ্রুতগতিতে। রাতের অন্ধকারে শুরু হলো মিশন। আস্তে ওরা সবাই নদীতে নামল। ওরা যখন নদীর মাঝখানে পৌঁছাল, তখন বৃষ্টির মতো গুলি আসতে লাগল ওদের ওপর। গুলির জন্য ওরা আর এগোতে পারছিল না। সে সময় ওদের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল কচুরিপানা। সেগুলো মাথার ওপর রেখে আক্রমণে না গিয়ে স্রোতের দিকেই ভেসে গেল ওরা। স্রোতের তীব্রতা ও পাকিস্তানি বাহিনীর তীব্রতা বিচার করে এক বিষাদের ছায়া নেমে এল সেক্টরে। পরের দিনও ওদের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। দুই দিন পর এসে আমার পায়ে প্রণাম করল নায়েক কুতুব। বলল, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি স্যার। আমি ওদের বুকে জড়িয়ে ধরলাম। চোখ দিয়ে আনন্দের জল গড়িয়ে পড়ল। কেবল বললাম, বেঁচে থাকো। জয় বাংলা।[১২]

শেষ কথা

কচুরিপানা সামান্য আগাছা। এই সামান্য আগাছাই অসামান্য হয়ে উঠেছিল ১৯৭১ সালে। নদীপথে আক্রমণে কচুরিপানাকে সামরিক নৌযানের মতোই যেন ব্যবহার করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা। কচুরিপানা মাথায় দিয়ে এগিয়ে আসছেন মুক্তিসেনা—পাকিস্তানি সেনারা ভাবত পানির স্রোতে স্রেফ কচুরিপানাই ভাসছে। কিন্তু এই কচুরিপানার নিচেই যে সশস্ত্র গেরিলা মুক্তিযোদ্ধার অবস্থান, তার কোনো ধারণাই করতে পারত না পাকিস্তানি সেনারা। তাই বলা যায়, কচুরিপানাকে ক্ষুদ্র ও আশ্চর্যজনক প্রাকৃতিক সাবমেরিন হিসেবে ব্যবহার করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা।

আর যাঁরা ডোবা-নালা-পুকুর অথবা পাশের নদীর পানিতে ডুবে দুই বা এর অধিক কচুরিপানার ফাঁকে শুধু নাকটা জাগিয়ে রেখে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচেছেন, তাঁদের কাছে এই আগাছা ছিল নিজেকে অদৃশ্য করার আশ্রয়কেন্দ্রের মতোই। কারণ হঠাৎ করে যখন পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণে এগিয়ে আসত, তখন ঘরের কোণে পালিয়ে থাকলেও বিপদ ছিল। অধিকাংশ ঘর তল্লাশি-পরবর্তী লুটপাট করে আগুন জ্বালিয়ে দিত হানাদাররা। আবার দৌড় দিলেও রক্ষা নেই। সেনাদের মেশিনগানের গুলির মুখে পড়ার ঝুঁকি ছিল। কারণ পলায়নরত গ্রামবাসীর ওপর গুলি চালানোর অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে সে সময়। তাই শত্রুর দৃষ্টি এড়াতে কচুরিপানায় ডুবে থাকার পথটিই ছিল প্রাণ বাঁচানোর সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ উপায়।

একাত্তরে এই ক্ষুদ্র আগাছার অবদান নিয়ে গবেষণা অব্যাহত থাকলে নিশ্চয়ই আরও চকমপ্রদ তথ্য বেরিয়ে আসবে। এতে সমৃদ্ধ হবে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাপিডিয়া, ভুক্তি : কচুরিপানা।

২. প্রাগুক্ত।

৩. আফসান চৌধুরী, '১৯৭১ : নারীর ইতিহাস কেন বাদ পড়ে যায়', দৈনিক *ইত্তেফাক*, স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যা, ২৬ মার্চ ২০১৮, ওয়েব লিংক : http://www.ittefaq.com.bd/ print-edition/shadinota-debosh/2018/03/26/266454.html

৪. শিশির কুমার মজুমদার, অনুলিখন—যতীন্দ্রমোহন মজুমদার, *রক্তপল্লবী ৭১— মৃত্যুতাড়িত শরণার্থীর যাত্রাপথ*, নয়া সেতু প্রকাশনা, ঢাকা, প্রকাশ—ডিসেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠা—৭১ থেকে ৭২।

৫. কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, ৩ মে ২০১৮, সন্ধ্যা ৬টা, সুফিয়া কামাল গণগ্রন্থগার, শাহবাগ, ঢাকা।

৬. শরিফা বুলবুল, 'তিন বেলা পেট ভরে খেতে চাই', দৈনিক *ভোরের কাগজ*, ১৯ জানুয়ারি ২০১৬।

৭. ড. শেখ আবদুস সালাম ও শিল্পী বেগম সম্পাদিত, *বীরাঙ্গনার আত্মকথন, ঢাকা*, একাত্তর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা—৭৫ থেকে ৭৬।

৮. 'কচুরিপানা মাথায় দিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন রাবেয়া', *ডয়চে ভেলে* প্রকাশ—২১ নভেম্বর ২০১২, https://www.dw.com/bn/%E0%A6%95%E0%A6%9A%E0%A7% 81% E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A4% E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE/a-16394491

৯. শাহজাহান সিদ্দিকী বীর বিক্রমের সাক্ষাৎকার, তারিখ : ৭ অক্টোবর ২০১৫, সময় : বেলা ১১টা থেকে ১টা।

১০. মুক্তিযোদ্ধা মো. হাতেম আলী, 'লঞ্চে গ্রেনেড মেরে দেড় শ হানাদার খতম করি', দৈনিক *কালের কণ্ঠ*, ৪ ডিসেম্বর ২০১৭।

১১. সালেক খোকন, 'যুদ্ধাহতের ভাষ্য : ৭৫, একাত্তরে পিতার যুদ্ধাপরাধও ক্ষমা করেননি মুক্তিযোদ্ধারা', *বিডি নিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ওয়েব লিংক : https://opinion.bdnews24.com/ bangla/archives/50429

১২. শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত, *সেক্টর কমান্ডাররা বলছেন মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা—৩০।

বই আলোচনা

ইহুদিদের প্রতিশ্রুত ভূমির অন্ধবিশ্বাসে গলদ

আসজাদুল কিবরিয়া

দ্য ইনভেনশন অব দ্য জুইশ পিপল—শ্লোমো স্যান্ড, (মূল হিব্রু থেকে ইংরেজি অনুবাদ : ইয়ায়েল লোটান), ভার্সো, যুক্তরাজ্য, ২০০৯। পৃষ্ঠা : ১২+৩৪৪

ইহুদিদের আদি উৎস নিয়ে বিতর্ক কম নেই। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের মাটিতে জোর করে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই বিতর্ক বেড়েছে ও নানা দিকে ধাবিত হয়েছে। পাশাপাশি সাত দশক ধরে ইহুদি সম্প্রদায়ের[১] ইতিহাস ও বিকাশকে বিরাট উচ্চতায় তোলা হয়েছে। আর তা করা হয়েছে ইসরায়েলি রাষ্ট্র ও জায়নবাদীদের[২] নিরন্তর পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রয়াসে। এই ইতিহাস নির্মাণ, বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে অতীতের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে হিব্রু বাইবেলে[৩] বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা, শতকের পর শতক ধরে গড়ে তোলা মিথ ও নানা মিথ্যার সুদক্ষ মিশেল ঘটানো হয়েছে। ফলে ইহুদি ও ইসরায়েলের সঠিক আদি ইতিহাস জানা দুরূহ হয়ে পড়েছে। জায়নবাদীদের পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস থেকে ছেঁকে বস্তুনিষ্ঠ বিষয়গুলো তুলে আনা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, জায়নবাদীরা সাফল্যের সঙ্গে এটা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন যে ইসরায়েল রাষ্ট্র ইহুদিদের জন্য ঈশ্বরের 'প্রতিশ্রুত ভূমি' (প্রমিজড ল্যান্ড)। তাঁদের দাবি, তারা হলো তানাখ বা হিব্রু বাইবেল অথবা প্রাচীন বিধানে বা ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত সেই জাতিগোষ্ঠীর সরাসরি উত্তরাধিকার, যারা মিসর থেকে সিনাই উপত্যকা হয়ে কেনানে ফিরে এসেছিল এবং তারাই ঈশ্বরের 'মনোনীত সম্প্রদায়' (চৌজেন পিপল)। মহাপ্রভু তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দুধ ও মধুর এ দেশে তারা শান্তিতে বসবাস করবে। এখানেই গড়ে উঠেছিল ডেভিড ও সোলেমানের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য, যা কালক্রমে ইসরায়েল ও জুদাহ নামে দুই ভাগ হয়। পরবর্তীকালে দুই দফা (একবার খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক, আরেকবার ৭০ খ্রিষ্টাব্দে) এই হিব্রু[৪] সম্প্রদায়ের বা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়

দফা নির্বাসনের পর থেকে ইহুদিরা মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তারা সব সময়ই জানত যে ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত ভূমিতে একদিন তারা বা তাদের উত্তরসূরিরা ফিরে আসবে। তাই ইহুদিদের তাদের স্বাতন্ত্র্য ও বংশধারার বিশুদ্ধতা রক্ষা করে এসেছে। সুতরাং আজ যে ইহুদিরা ইসরায়েলে বসবাস করছে, তারা দুই হাজার বছর আগে এই ভূমিতে আবাস গড়ে তোলা হিব্রু সম্প্রদায়ের মানুষেরই বংশধর।

ইহুদিদের, বিশেষ করে জায়নবাদীদের এসব দাবির সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিকভাবে নানা প্রশ্ন তোলা যায়। আর এ রকম প্রশ্ন তোলা হলেই প্রশ্ন উত্থাপনকারীকে সেমেটীয় বিরোধী[৫] আখ্যায়িত করা হয়। সেমেটীয় বিরোধী বলতে ইহুদিবিদ্বেষ বোঝানো হয়, যদিও সেমেটীয়দের মধ্যে আরব, ইথিওপীয় ও অ্যাসিরীয়রা অন্তর্ভুক্ত। আর সেমেটীয় ভাষাভাষী মানুষকে সেমেটীয় জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক আচরণকে বোঝাতে গিয়ে সেমেটীয় বিরোধী শব্দগুচ্ছের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীকালে জায়নবাদীরা এই শব্দগুচ্ছকে সাফল্যের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক রূপ দেয়। এর ফলে পাশ্চাত্যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের শরীরে একবার 'সেমেটীয় বিরোধী' শব্দগুচ্ছ সেঁটে দেওয়া গেলে তার জীবনযাপন কঠিন হয়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে এটাও প্রমাণিত হয় যে শতকের পর শতক ধরে ইহুদিরা অন্য সব জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম সম্প্রদায়ের চেয়ে নিজেদের উৎকৃষ্ট মনে করে এলেই আত্মগরিমায় ভুগে আসছে। তাই 'বাইবেল ধর্মগ্রন্থে হিব্রুরা দাবি করেছে, জগতের আর সব জাতি থেকে তারা স্বতন্ত্র; সবার উর্ধ্বে তাদের স্থান; শ্রেষ্ঠত্বের এমন সুস্পষ্ট দাবি বোধ করি ভারতের ব্রাহ্মণজাতি ও জার্মানির "হেরেনভোল্ক" ছাড়া আর কোনো জাতি করেনি। ঈশ্বরের সঙ্গে ইহুদি জাতির রয়েছে ঘনিষ্ঠতম অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তারাই ঈশ্বরের প্রিয়তম জাতি, 'নির্বাচিত জাতি', যে জাতির ঘটেছিল ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য। জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের বাহন বাইবেল, জাতির সেই শ্রেষ্ঠত্ব ভাবনাই বাইবেলকে সত্যিকার সাহিত্যের মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে কথায় গানে স্তবে স্তোত্রে অপরূপ শোভা-সৌন্দর্যের ফুলঝুরি ফুটিয়ে দিয়েছে।'[৬]

আবার ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহে এটাও দেখা যায় যে ইহুদিরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অন্য জাতিগোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষ দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে। ইহুদি হওয়ার কারণেই তাদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালানো হয়েছে। এই নির্যাতিত মানুষেরা তাই একটি পর্যায়ে উপলব্ধি করে যে একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি তথা দেশ না হলে তাদের ওপর এই নির্যাতন বন্ধ হবে না। সে কারণেই তারা নিজেদের আবাসভূমি স্থাপনের জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়। আর এই আবাসভূমি সেই প্রাচীন জুদা-সামারিয়াতেই হতে হবে—এমন দাবি তুলে ধরেন জায়নবাদীরা।

কেননা, এটাই ঈশ্বর হিব্রুদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন!

তবে ইহুদি জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র পরিচয় ও দুই হাজার বছরের বেশি সময়ের ইতিহাসের সঠিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ইসরায়েলি ইতিহাসবিদ শ্লোমো স্যান্ড। তিনি তাঁর বহুল আলোচিত-সমালোচিত *দ্য ইনভেনশন অব দ্য জিউইশ পিপল* (ইহুদি সম্প্রদায়ের উদ্ভব) শীর্ষক বইয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে জায়নবাদীরা ইহুদি সম্প্রদায়ের বা ইহুদি জনগোষ্ঠীর আদি উৎস ও বিকাশের যে ইতিহাস তৈরি করেছে, তা বহুলাংশে কল্পিত ও অসত্য। তবে জায়নবাদীদের জন্য এই কাজ দরকার ছিল। কেননা, জায়নবাদীরা ইহুদিদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি তথা রাষ্ট্র স্থাপনের যে আন্দোলনের সূচনা করে, তার সমর্থনে ইহুদিদের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প ছিল না। স্যান্ডের মতে, 'ইহুদি ইতিহাসের ব্যাখ্যা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন মনে হয় মেধাবী ও সৃজনশীল ইতিহাসবিদেরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের যেসব খণ্ডিত ধর্মীয় স্মৃতি টিকে রয়েছে, তার ওপর ইহুদি সম্প্রদায়ের নিরন্তর বংশপরম্পরা দাঁড় করিয়েছেন। ইহুদিবাদের বিস্তৃত ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু ১৯ শতকের শেষভাগে ও ২০ শতকের শুরুতে দাঁড় করানো মৌলিক ধারণাগুলো নিয়ে কেউ কখনো কোনো প্রশ্ন তোলেনি। যেসব আবিষ্কার এই সরল অতীতকে হুমকিতে ফেলতে পারে, সেগুলোকে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে। (ইসরায়েলের) জাতীয় বাধ্যবাধকতায় বহুল প্রচলিত কাহিনি থেকে কোনো বিচ্যুতি বা কাহিনির সঙ্গে বিরোধপূর্ণ যেকোনো কিছু পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলো শুধু "ইহুদি জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে" অনুগত হয়েছে, যা কিনা ইসরায়েলে সাধারণ ইতিহাস হিসেবে শিক্ষাদান কার্যক্রম থেকে ভিন্ন। এই আনুগত্য বাছাইকৃত দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে বিরাট অবদান রেখেছে। ইহুদিত্ব কী, সে বিতর্কের অবশ্যই আইনি তাৎপর্য আছে। কিন্তু ইতিহাসবিদেরা তা উপেক্ষা করেছেন। তাঁদের কাছেও দুই হাজার বছর আগে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হওয়া মানুষের যেকোনো উত্তরসূরিই ইহুদি।'[৭] স্যান্ডের সারকথা হলো এ রকম যে দুই হাজার বছর আগে হিব্রু জনগোষ্ঠীর নির্বাসনে যাওয়ার ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার যে ইতিহাস তুলে ধরা হয়, তা ঠিক নয়, বরং পূর্ব ইউরোপের ইহুদিদের সিংহভাগই আসলে ইউরোপের মাটিতে ধর্মান্তরিত ইহুদি। কাজেই দুই হাজার বছর ধরে হিব্রু জনগোষ্ঠী রক্তের ও বংশপরম্পরার বিশুদ্ধতা রক্ষার যে দাবি করে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলছেন, 'ইতিহাসজুড়ে ইহুদিরা কখনোই একটি অভিন্ন জাতি ছিল না, বরং ছিল বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের মিশ্রণ, তবে সবাই ছিল একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী। বাইবেলের কাহিনিগুলো চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর, তবে একই সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে ঠিক নয়। বাইবেল একটি সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম, একটি "ঐতিহাসিক পুরাকথা", যা কিনা খ্রিষ্টপূর্ব ছয় শতকে রচিত হয় আর ইহুদি

গোত্রগুলোর জগৎ গঠন করে যারা বিভিন্ন উৎস থেকেই ইহুদিবাদকে পেয়েছিল। কিন্তু ইহুদিরা কখনোই তাদের নিজ ভূমিতে ফিরে যায়নি, কেননা তারা কখনোই এখান থেকে নির্বাসিত হয়নি। তাই, আধুনিক জায়নবাদী ইতিহাস ইহুদি একতার একটি জাতিগত তত্ত্ব, ইহুদি নির্বাসনের ও প্রত্যাবর্তনের একটি জাতীয় পুরাকথা দাঁড় করায়, যা আগে কখনোই ছিল না। আর এই পুরাকথা নির্মাণ করা হয় আদিবাসী ফিলিস্তিনি জনগণকে বিতাড়নের জন্য যারা হয়তো প্রাচীন জুদাহ রাজ্য থেকে উৎসরিত।'[৮]

শ্লোমো স্যান্ডের মূল বইটি হিব্রু ভাষায় লেখা। 'মাতাই ভেএখ হুমতজা হায়াম হাইহুদি?' হিব্রু নামের আক্ষরিক অনুবাদ করা হলে তা দাঁড়ায়, 'কখন ও কীভাবে ইহুদি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল?' যদিও কিছুটা ঘুরিয়ে ইংরেজি নামকরণ হয়েছে 'দ্য ইনভেনশন অব দ্য জিউইশ পিপল'[৯]। বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, 'ইহুদি সম্প্রদায়ের উদ্ভব'। নামের মধ্য দিয়েই লেখকের উদ্দেশ্য অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলতে চেষ্টা করছেন যে 'ইহুদি সম্প্রদায়' বা 'ইহুদি জনগোষ্ঠী' ধারণাটি অনেকটা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে বা ধারণাটি বহুলাংশে আরোপিত। বইটি প্রকাশের পর তীব্র সমালোচনা ও নানা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে দফায় দফায় কলম ধরতে হয়েছে শ্লোমো স্যান্ডকে। বক্তৃতা ও বিতর্কে অংশ নিতে হয়েছে। বিশেষ করে জায়নবাদ ও ইসরায়েলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলে আঘাত করায় জায়নবাদীরা যারপরনাই ক্ষিপ্ত হয়েছেন। তবে স্যান্ড তাঁর অবস্থানে অনড় থেকে বলেছেন, 'আমি শুধু (ইহুদিদের) নির্বাসনে যাওয়ার পুরাকথারই সমালোচক নই, বরং জুদাবাসীরা ফিলিস্তিনে "তাদের আবাসভূমি" ছেড়ে কখনো অভিবাসী হয়ে চলে গেছে, আমি সুনির্দিষ্টভাবে এই তত্ত্বেরও সমালোচক। গোটা বইয়ে আমি দেখাতে চেয়েছি যে ইহুদিবাদ কোনো গণহারে অভিবাসনের ফল নয়, বরং গতিশীল ধর্মান্তরপ্রক্রিয়া ও একটি গুরুত্বপূর্ণ একেশ্বরবাদী ধর্মের বিস্তারের ফল। ইহুদিরা জুদা থেকে "অদৃশ্য" হয়নি এবং নিশ্চিতভাবেই কখনো নিজ ভূমি থেকে নির্বাসিত[১০] হিসেবে বসবাস করেনি।'[১১]

সূচনাসহ বইটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। 'সূচনা : স্মৃতির ভার'[১২] শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে ইহুদি পরিচয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। 'জাতিসমূহের গঠন : সার্বভৌমত্ব ও সমতা'[১৩] শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে তিনি জাতি, সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর প্রচলিত তাত্ত্বিক ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন এবং এসব ধারণার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছেন। 'মিথোইতিহাস : শুরুতে ঈশ্বর সম্প্রদায়টি তৈরি করলেন'[১৪] শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি হিব্রু বাইবেলের সূত্রে ইহুদিদের মহাপ্রভুর বিশেষ বা মনোনীত জনগোষ্ঠী হিসেবে বহুল প্রচারিত দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। আর তা করেছেন ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বাইবেলের গ্রহণযোগ্যতাকে নাকচ করে দিয়ে। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'নির্বাসনের উদ্ভাবন : ধর্মান্তরীকরণ ও রূপান্তর'[১৫], যেখানে তিনি দেখাচ্ছেন যে আদি

বাসভূমি থেকে হিব্রু জনগণের নির্বাসনের যে বিবরণ ইতিহাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা মোটেও ঠিক নয়। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'নীরবতার রাজ্য : (ইহুদিদের) হারানো সময়ের সন্ধানে'[১৬] যেখানে লেখক বর্তমান ইহুদিদের বিভিন্ন স্থানে অতীত উৎসের কথা তুলে ধরেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'স্বাতন্ত্র্য : ইসরায়েলে পরিচয়ের রাজনীতি'[১৭] যেখানে স্যান্ড ইসরায়েলকে ইহুদি সম্প্রদায়ের নয়, বরং ইসরায়েলি নাগরিকদের রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার ওপর জোর দিয়েছেন।

দুই.

দেশ, রাষ্ট্র, জাতি, সম্প্রদায়, গোত্র ও জনগোষ্ঠীর তাত্ত্বিক সংজ্ঞা ও পরিসর নিয়ে মতভেদ আছে। বলা হয়, জাতি হচ্ছে যেকোনো ঐতিহাসিক যুগে একটি নির্দিষ্ট ভূভাগে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত ও ঐতিহাসিকভাবে রপ্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অভিন্ন বিবেচিত জনসমষ্টি, যারা অভিন্ন আত্মপরিচয়ে সমস্বার্থ-বোধে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মোন্নয়নের জন্য তৎপর।[১৮] আর সম্প্রদায় হচ্ছে জাতির অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর জনসমষ্টি, যারা অভিন্ন আঞ্চলিক অবস্থান বা ঐতিহ্যের ভিত্তিতে সম্পর্কিত ও অভিন্ন বিবেচিত ও সমস্বার্থে পরস্পরের সহায় ও সহযোগী।[১৯] তার মানে হলো, জাতির পরিধি সম্প্রদায়ের বা জনসমাজের চেয়ে অনেক বড় ও ব্যাপ্ত। নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডের অধিবাসী, যাদের ভাষা ও সাহিত্য একই ধরনের এবং যেখানে বিশেষ এক ধারাবাহিকতা থাকে ও আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি প্রায় অভিন্ন, তারা সমষ্টিগতভাবে ওই ভূখণ্ডের জনগণ বা জনসমাজ হিসেবে পরিচিত।[২০] আর নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে বসবাসকারী বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী বহুকাল ধরে প্রায় একই ধরনের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এবং যদি তাদের মধ্যে দীর্ঘকালীন পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আদান-প্রদান লক্ষ করা যায়, তবে সেই বিচিত্র মানবগোষ্ঠীকেও জনসমাজ বলতে অসুবিধা নেই।[২১] জাতি হলো জনসমাজেরই চূড়ান্ত রূপ। তাই বলা যায় যে নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক এলাকার জনগণ যখন একই বংশ, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ এবং সুখ-দুঃখ, ত্যাগ-আবেগ, ঐতিহ্য ও গৌরববোধ অভিন্নহৃদয় হয়ে একই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যে উপনীত হতে চায় এবং অন্যান্য জাতিত্ব থেকে নিজেদের পৃথক মনে করে এবং সংগঠিতভাবে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়, তখন তাদের জাতিসত্তা দানা বাঁধে। আর সার্বভৌম ক্ষমতা আয়ত্ত হলে জাতি একটি রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয়।[২২]

এসব কারণেই শ্লোমো স্যান্ড বলছেন, 'সম্প্রদায়, জনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনগণ, গোত্র ও ধর্মীয় সম্প্রদায় কেউই জাতি নয়, যদিও প্রায়ই তা বলা হয়।' বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে তিনি বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিতের গবেষণা ও পর্যালোচনা উদ্ধৃত করে পুরো

বিষয়টির জটিলতা ও বিভ্রান্তি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি খুব সুস্পষ্ট কোনো উপসংহারে পৌঁছাতে পারেননি বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে পাঠকের কাছে জাতি ও সম্প্রদায়ের বিষয়ে স্যান্ডের সার্বিক মনোভাব ও অবস্থান একটু অস্পষ্ট থেকে যায়। তিনি জনসমাজ বা সম্প্রদায় বলতে একই ধরনের খাওয়া-পরা, আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও চালচলনে অভ্যস্ত জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক বা একাধিক ধর্মাবলম্বী থাকতে পারে। তিনি জাতীয়তাবাদের ধারণাকে একধরনের মোহ বা বিভ্রান্তি বলে মনে করেন। কেননা, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির উৎস খুঁজতে গিয়ে যেসব নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা চালানো হয়েছে, সেসব গবেষণা প্রতিটি জাতিগত ও জাতিসত্তার পরিচয়কে বিব্রতকর দিকে নিয়ে গেছে বলেও স্যান্ড বিশ্বাস করেন। তবে পাঠকেরা যদি বইটি পড়তে গিয়ে প্রথম অধ্যায়টি বাদ দিয়ে যান, তাহলে তেমন কোনো সমস্যা হবে না। কেননা, পরের অধ্যায়গুলোতেও প্রাসঙ্গিকভাবে লেখক জাতি, সম্প্রদায় ও জনসমাজ-সম্পর্কিত অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন।

তিন.

স্যান্ড তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেশ জোরালোভাবে হিব্রু বাইবেলভিত্তিক প্রচলিত ইহুদি ইতিহাসকে তথ্য-প্রমাণসহযোগে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি বলছেন, 'এটা মনে রাখা দরকার যে বাইবেলের পরিশোধিত "সত্য" মানবজাতির ইতিহাসের কোনো সর্বজনীন ভাষ্য নয়। বরং এটি হলো পবিত্র সম্প্রদায়ের কাহিনি, যাদের আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ মানবজাতির প্রথম জাতিতে রূপান্তর করেছে।' (পৃ. ৬৫)

এখানে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে বাইবেল মূলত খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থমালা। তাই একে খ্রিষ্টীয় বাইবেল বলা হয়।[২৩] গ্রিক শব্দ বিবিলা (বই) থেকে উদ্ভূত বাইবেল শব্দটি খ্রিষ্টীয় চার শতক থেকে খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যদিও এতে ইহুদি ও খ্রিষ্টান উভয় ধর্মের পবিত্র বাণীর সংকলন রয়েছে। তবে বাইবেল দুটি ভাগে বিভক্ত: ওল্ড টেস্টামেন্ট (প্রাচীন পাঠ) ও নিউ টেস্টামেন্ট (নতুন পাঠ)। ওল্ড টেস্টামেন্ট আদিতে হিব্রু ভাষায় লিখিত হয়েছিল বলে এটি হিব্রু বাইবেল নামেও পরিচিত। এটি ৩৯টি গ্রন্থের এক সংকলন, যা মূলত ইহুদিদের পবিত্র রচনা হিসেবে বিবেচিত। এগুলো দীর্ঘ সময় ধরে রচিত হয়েছে।[২৪] হিব্রু বাইবেল গ্রন্থমালার প্রথম পাঁচটি রচনার বা পঞ্চকের (পেনটিচিউড) প্রথমটি হলো 'জেনেসিস', দ্বিতীয়টি হলো 'একসোডাস', তৃতীয়টি হলো 'লেভিটিকাস', চতুর্থটি হলো 'নাম্বারস' আর পঞ্চমটি হলো 'ডিউটারোনমি'। এই পঞ্চকই হলো আবার তোরাহ (ইসলামি পরিভাষায় তাওরাত) যদিও গোটা হিব্রু বাইবেলকেও প্রায়ই লিখিত তোরাহ বা তানাখ বলা হয়। তোরাহ হিব্রু শব্দ, যার মানে হলো আইন বা নির্দেশনা।[২৫] অন্যদিকে নতুন পাঠ বা নিউ টেস্টামেন্ট ২৭টি গ্রন্থে বিভক্ত এবং তাতে

যিশুখ্রিষ্টের জীবনী ও তাঁর শিক্ষা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থের আলাদা নাম আছে এবং প্রতিটিই কয়েকটি করে অধ্যায়ে ও স্তবকে বিভক্ত। এগুলো ৫০ থেকে ১০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল।[২৬]

স্যান্ড দেখাচ্ছেন যে প্রথম শতকে ফ্লেভিয়াস জোসিফাসের লেখা *অ্যান্টিকিউটিজ অব দ্য জুইশ* বইটির পর আধুনিক কালের বা উনিশ শতকের আগ পর্যন্ত ইহুদিদের নিজেদের মধ্যে তাদের একটি সাধারণ ইতিহাস রচনার তেমন কোনো তাগিদ বা প্রয়াস দেখা যায়নি। 'যদিও ইহুদি একেশ্বরবাদ জন্ম নিয়েছিল ধর্মতত্ত্বীয়-ঐতিহাসিক পুরাকথার আবরণে, তবু মধ্যযুগ বলে কথিত দীর্ঘ সময়কালে কোনো ইহুদি ইতিবৃত্ত প্রণীত হয়নি। কালানুক্রমিক বিবরণী তৈরির খ্রিষ্টীয় উন্নত প্রথা কিংবা ইসলামি ইতিহাসের সাহিত্যকর্ম কোনোটাই রাবাই ইহুদিবাদের কাছে কোনো ধরনের আবেদন তৈরি করেনি। বিরল ব্যতিক্রম বাদে এই রাবাই ইহুদিবাদ[২৭] নিকট বা দূর অতীতের যেকোনো কিছুই পরীক্ষা করার ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছিল' (পৃ: ৬৫-৬৬)। অর্থাৎ রাবাইপন্থীদের কাছে অতীতের ঘটনাপ্রবাহ (তোরাহ বাদে) কখনোই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

স্যান্ড জানাচ্ছেন, ১৮২০ সালে জার্মান ইহুদি ইতিহাসবিদ আইজ্যাক মারকুস ইয়োস্টের লেখা *ইসরায়েলিদের ইতিহাস* বইটিকে ইহুদিদের ইতিহাসের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বই হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে ইয়োস্ট তাঁর বইয়ে বাইবেলের প্রাচীনকালকে এড়িয়ে জুদাহ রাজ্য থেকে যাত্রা শুরু করেছেন। স্যান্ডের মতে, ইয়োস্ট ভালোভাবেই জানতেন যে তাঁর সময়কালের (আঠারো শতকের শেষ ভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ) ইহুদিরা কোনো নিরবচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক জাতিসত্তার ধারা বহন করে না। বরং তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইহুদিদের ঐতিহাসিক বিবরণী তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে ইসরায়েলিরা স্থানভেদে আলাদা। উল্লেখ্য, ইয়োস্টের সময়কালে জার্মান ও ফ্রান্সে অনেকেই মোজেসের ধর্মানুসারীদের ইসরায়েলি হিসেবে গণ্য করত। আর তাদের কাছে ইহুদি পরিচয় নেতিবাচক মনে হতো (পৃ-৬৭)। স্যান্ডের মতে, 'আধুনিক সময়ে ইহুদি ইতিহাস রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্পটি কোনো জাতিগত আলোচনার বিষয় ছিল না আর সেখানে বাইবেলের বর্ণিত ইতিহাসকে এই ইতিহাসের অংশ হিসেবে নেওয়ায় লেখকদের মধ্যে দোদুল্যমানতা কাজ করেছে' (পৃ. ৬৮)।

স্যান্ড এই অধ্যায়ে বেশ কয়েকজন ইতিহাসবিদ ও বিশেষজ্ঞের কাজ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন জ্যাক বাসনেজ, লিওপোল জুনস, আব্রাহাম গাইগার, হাইনরেখ গ্রিটৎস প্রমুখ। ইহুদিদের ইতিহাস বিষয়ে এঁদের রচনাগুলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন স্যান্ড। তিনি বলছেন, 'বাইবেলের জাতীয়করণ ও তাকে একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থে রূপান্তরের কাজটি শুরু হয়েছিল হাইনরেখ গ্রিটৎসের রোমান্টিক কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে, যা কিনা দুবনাও ও ব্যারোনের সতর্কতার মধ্য

দিয়ে বিকশিত হয়েছে এবং জায়নবাদী ইতিহাস রচয়িতাদের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়েছে, যাঁরা কিনা প্রাচীন ভূখণ্ডটির আদর্শিক সুনির্দিষ্টতা স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। প্রথম যেসব ইতিহাসবিদ আধুনিক হিব্রুতে লিখেছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ ভুলভাবে বিশ্বাস করতেন যে হিব্রু সরাসরি বাইবেলীয় ভাষা থেকে এসেছে। আর তাঁরাই আজ গণ্য হচ্ছেন ইহুদি জাতির সুদীর্ঘ স্মৃতির সংরক্ষক ও উদ্ধারকারী হিসেবে' (পৃ. ১০৭)।

১৮৯৭ সালে হাঙ্গেরীয় সাংবাদিক, আইনজীবী ও নাট্যকার থিওডোর হারজেল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন বৈশ্বিক জায়নবাদী সংস্থা (ওয়ার্ল্ড জায়নিস্ট অর্গানাইজেশন)। প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফিরে যাওয়া তথা ইহুদিদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি গঠন ও তার বিকাশ সাধনই হয় এই উগ্র জায়নবাদের লক্ষ্য, যা কিনা অল্প সময়ের মধ্যে ইউরোপের খ্রিষ্টানদের একাংশের সমর্থন লাভ করে। এসব খ্রিষ্টানকে তাই বলা হয় জায়নবাদী খ্রিষ্টান। হারজেল ও তাঁর সহযোগীরা ফিলিস্তিনে ইহুদি আবাসভূমি স্থাপনের জন্য নানামুখী তৎপরতা শুরু করেন। যদিও সে সময় একবার ফিলিস্তিন সফর করে হারজেলের তা মোটেও পছন্দ হয়নি, পছন্দ হয়নি সেখানকার প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যময় গঠন।[২৮] তার বদলে তিনি আর্জেন্টিনার পাতাগোনিয়াকে ইহুদিদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য অধিকতর উপযোগী মনে করেছিলেন। কিন্তু ফিলিস্তিন ভূখণ্ড সরাসরি প্রাচীন জুদাহ-সামারিয়া-ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাইবেলের মিথোইতিহাস সত্য প্রমাণ করতে হলে অন্যত্র ইহুদিদের স্বদেশ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কাজেই প্রয়োজন হয়ে পড়ল জায়নবাদী ঘরানায় ইহুদিদের ইতিহাস রচনার ও বাইবেলকে জাতীয়করণের। স্যান্ড দেখাচ্ছেন যে বাইবেলকে জাতীয়করণ করে এর আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় অর্থ পাল্টে ফেলে একে সুদূর অতীতের ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ-সংবলিত এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন জায়নবাদীরা।

কিন্তু শুধু বাইবেল দিয়ে তো আর ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে হিব্রু জনগোষ্ঠীর একচ্ছত্র দাবি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং বাইবেলের মিথোইতিহাসের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে আশ্রয় নেওয়া হলো প্রত্নতত্ত্বের। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সেখানকার বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজের জোয়ার দেখা দিল। আর এসব খনন থেকে উঠে আসতে থাকল দুই হাজার বছর আগের হিব্রু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের বিভিন্ন বিচিত্র তথ্য। কিন্তু জায়নবাদীদের নির্দেশনার বাইরে গিয়ে যখন স্বাধীনভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা বাড়তে থাকল, তখনই দেখা দিল বিপত্তি। প্রায়ই এমন সব তথ্য মিলতে লাগল, যা কোনোভাবেই এই ভূখণ্ডে ইহুদিদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে জায়নবাদীদের দাবীকৃত ও বর্ণিত নানা কাহিনি ও ঘটনাকে সমর্থন করে না। স্যান্ড বলছেন, '১৯৬৭-পরবর্তী প্রত্নতাত্ত্বিক ও বাইবেল বিশেষজ্ঞরা (ডেভিড ও সোলেমানের) শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে থাকেন। বাইবেল অনুসারে এই সাম্রাজ্য দলপতিদের পরবর্তীকালে দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

১৯৭০-এর দশকে, ইসরায়েল সরকার দ্বারা "নগরটি চিরদিনের জন্য একত্র" হওয়ার পর, জেরুজালেমে খননকাজ গৌরব অতীতের কল্পগাথার পতন ঘটায়। হারাম-আল-শরিফের নিচে খনন সম্ভব ছিল না, কিন্তু অন্য সব উন্মুক্ত জায়গায় খননকাজ চালানোর পরও ডেভিড-সোলেমানের আনুমানিক সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতকের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। সুবৃহৎ কাঠামো ও মহাপ্রাসাদের প্রাচীরের কোনো নিদর্শন কখনোই মেলেনি, আর যেসব মাটির পাত্র পাওয়া গেছে, সেগুলো নিতান্তই অপ্রতুল ও সাধারণ। প্রথমে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে নগরটি দখল করায় এবং হ্যারডের (জুদার রোমান রাজা) রাজত্বকালে (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৭-০৪) ব্যাপক নির্মাণযজ্ঞ চালনা করায় অতীতের অনেক কিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর আগের সময়কালের জেরুজালেমের ইতিহাসের অনেক কিছুর সন্ধান পাওয়ায় এই যুক্তি নাকচ হয়ে যায়' (পৃ. ১২০)।

স্যান্ড জোরালো ভাষায় বলছেন, 'প্রত্নতাত্ত্বিক ও বাইবেলবিষয়ক বেশির ভাগ নতুন পণ্ডিত যে উপসংহার মেনে নিয়েছেন তা হলো, সেখানে কখনোই কোনো বিশাল ও একত্র রাজতন্ত্র ছিল না, রাজা সলোমনের কখনোই কোনো মহাপ্রাসাদ ছিল না, যেখানে কিনা তাঁর ৭০০ স্ত্রী ও ৩০০ উপপত্নী বসবাস করতেন। বস্তুত বাইবেল কখনোই এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের কথা বলেনি, যা কিনা এই উপসংহারকেই জোরদার করে। পরবর্তীকালের লেখকেরা এসব কথা বানিয়েছেন এবং শক্তিশালী রাজ্যকে গৌরবান্বিত করেছেন, যা কিনা একজন দেবতার অনুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের অসাধারণ ও স্বাতন্ত্র্যময় কল্পনার ফলে বিশ্ব সৃষ্টির ও ভয়াবহ বন্যার বিখ্যাত গল্পগুলো তৈরি হয়েছে, তৈরি হয়েছে পূর্বপুরুষদের বিস্ময়গুলো, দেবদূতের সঙ্গে জ্যাকবের যুদ্ধ, মিসর থেকে নিষ্ক্রমণ ও লোহিত সাগর দুই ভাগ হওয়া, কেনান বিজয় ও জিইবিওনে সূর্যের অলৌকিক থেমে যাওয়ার মতো কাহিনিগুলোর। মরুভূমি থেকে উঠে আসা বিস্ময়কর জাতি, যারা জয় করেছিল বিশাল ভূমি ও নির্মাণ করেছিল গৌরবময় রাজ্য, তাদের আদি উৎস বিষয়ে কেন্দ্রীয় পুরাকথাগুলো ইহুদি জাতীয়তাবাদ ও জায়নবাদী ঔপনিবেশীকরণের উত্থানের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক শতাব্দী ধরে এগুলো আনুশাসনিক মানের পাঠগত রসদের জোগান দিয়েছে, যা কিনা একটি জটিল রাজনৈতিক পরিচয় ও ভূখণ্ডগত সম্প্রসারণের আত্মযৌক্তিকতা ও ব্যাপক আত্মত্যাগের চাহিদাকে চাঙা করেছে। তবে ইসরায়েলে ও বিদেশে ঝামেলাপূর্ণ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও বাইবেল পণ্ডিতেরা এসব পুরাকথার পতনসাধনের চেষ্টা করেছেন, যা কিনা বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে এমনতর কাহিনির মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, যার সঙ্গে প্রকৃত ইতিহাসের রয়েছে সাগরতুল্য ব্যবধান। ইসরায়েলি সমাজ যদিও অত জড়িত নেই আর তাদের অত প্রয়োজন নেই ঐতিহাসিক বৈধতার, যা এর সৃষ্টি ও অস্তিত্ব সমর্থন করে, তবু এই

সমাজ নতুন অনুসন্ধান মেনে নিতে সমস্যায় ভোগে আর জনসাধারণ গবেষণার দিক পরিবর্তনকে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করে' (পৃ. ১২২-১২৩)।

শ্লোমো স্যান্ড যা বলে এই অধ্যায়ের উপসংহার টানছেন, তা বাংলায় রূপান্তর করলে এ রকম দাঁড়ায়, 'বহু শতাব্দী ধরে বাইবেল তিনটি একেশ্বরবাদী সংস্কৃতির—ইহুদি ধর্মমত, খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম—কাছে স্বর্গীয়ভাবে উৎসাহিত কাজ হিসেবে, ঈশ্বরের উদ্ভাস ও বিশিষ্টতম কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আধুনিক কালে জাতীয়তাবাদের উত্থানের সময়ে এটা ক্রমেই অতীতের পুনর্গঠন হিসেবে মানুষের দ্বারা গ্রন্থিত কাজ হিসেবে দেখা হতে থাকে। এমনকি প্রাক্-জাতীয়তাবাদী প্রটেস্টান্ট ইংল্যান্ডে এবং আরও বেশি করে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় পিউরিটান বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে একটি আধুনিক ধর্ম-রাজনীতির সমাবেশ গড়ে তোলার জন্য এ বইটি নৈরাজ্য ও কল্পনার মাধ্যমে একধরনের আদর্শ ছাঁচ হিসেবে দেখা দেয়। অতীতে ইহুদি বিশ্বাসীরা এর ভেতরে প্রবেশ করার দিকে ঝোঁকেনি। কিন্তু ইহুদি আলোকায়ন বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে অধিকসংখ্যক শিক্ষিত মানুষ বাইবেলকে ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়তে ও বিশ্লেষণ করতে শুরু করে। তারপরও, যেমনটি এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রাক্-জাতীয়তাবাদী ইহুদি ইতিহাস রচনা শুরু হলে তা বাইবেলকে আধুনিক ইহুদি জাতির উত্থানের নাটকে একটি নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় নিয়ে আসে। গ্রন্থটি ধর্মীয় এলাকার তাক থেকে রূপান্তরিত হয় ইতিহাসের শাখায়। ইহুদি জাতীয়তাবাদে অনুগতরা এমনভাবে এটি পড়তে শুরু করে, যেন এটা (অতীতের) বিভিন্ন ঘটনা ও প্রক্রিয়ার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে এটা উপনীত হয় মিথোইতিহাসের পর্যায়ে, যা কিনা অকাট্য সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে। এটা হয়ে ওঠে ইহজাগতিক পবিত্রতার স্থান, যেখানে হাত দেওয়া যাবে না। আর হয়ে ওঠে এমন বিষয়, যেখান থেকে সম্প্রদায় ও জাতির যাবতীয় বিবেচনা অবশ্যই শুরু করতে হবে। সর্বোপরি বাইবেল হয়ে ওঠে একটি জাতিগত চিহ্নিতকারী উপাদান, যা কিনা ব্যাপকভাবে ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির মানুষের এক অভিন্ন উৎস নির্দেশ করে। অথচ এরা সবাই এখনো তাদের ধর্মের জন্য ঘৃণীত, যদিও তারা খুব কম এই ধর্মাচার পালন করে। এর অর্থ হলো, এক সুপ্রাচীন জাতি, যে কিনা সৃষ্টির প্রায় শুরু থেকে উৎসরিত এবং যে কিনা সেসব মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে, যারা নিজেদের রুক্ষ-স্খলিত আধুনিকতার মধ্যে স্থানচ্যুত মনে করে। এটা তাদের অতীতের চেতনার মধ্যে গেঁথে ছিল। বাইবেলের অলৌকিক ও কিংবদন্তিময় বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও (অথবা সম্ভবত এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে) এর উদার হৃদয় এক দীর্ঘ, বলতে গেলে এক চিরন্তন অন্তর্ভুক্তির ধারণা প্রদান করে, দ্রুত অগ্রসরময় অস্থির বর্তমান যা তাদের দিতে পারেনি। আর এভাবেই বাইবেল হয়ে ওঠে ইহজাগতিকতার বা

ধর্মনিরপেক্ষতার এক গ্রন্থ, যা কিনা বিদ্যালয়ের শিশুরা পড়তে শেখে তাদের সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে জানতে। এই শিশুরাই পরবর্তীকালে গর্বের সঙ্গে সৈনিক হিসেবে উপনিবেশ ও স্বাধীনতার যুদ্ধে লড়াই করে' (পৃ. ১২৭-১২৮)।

চার.

বইটির তৃতীয় অধ্যায়ে এসে শ্লোমো স্যান্ড হিব্রু জাতির ইতিহাসের আদিপর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিকে নাকচ করে দেওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে সুপ্রাচীনকালে তারা বাববার ভূমি থেকে বিতাড়ন ও নির্বাসনের শিকার হয়েছে। মিসর থেকে মোজেসের নেতৃত্বে হিব্রুদের মহানিষ্ক্রমণ[২৯] বাইবেলে অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে।

স্যান্ড বলছেন, 'উৎখাত ও বিতাড়নের ধারণাগুলো সব ধরনের ইহুদি ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে। তবে সেগুলোর গুরুত্ব এই ধর্মের ইতিহাসের পালাক্রমের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। আর এগুলো সব সময় যে ইহজাগতিক অর্থ বহন করে তা-ও নয়। খ্রিষ্টপূর্ব ছয় শতকে জুদা রাজ্যের পতন হওয়ার পর জোর করে বিতাড়িত হওয়া সম্ভ্রান্ত লোকজনদের মধ্যেই ইহুদি একেশ্বরবাদের ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। নির্বাসনে যাওয়া ও যাযাবর হওয়ার ছবি তো তোরা-য়, নবীদের মাঝে ও লেখনীর (হিব্রু বাইবেলের শেষ অধ্যায়ে) বড় অংশজুড়ে ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, কখনো সরাসরি আর কখনো বিমূর্তভাবে। স্বর্গোদ্যান থেকে বিতাড়ন, আব্রাহামের কেনানে অভিবাসন ও জ্যাকবের উত্তরসূরিদের মিসরে অভিবাসন, এবং জেখারায়া ও ড্যানিয়েলের পূর্বাভাস ইত্যাদি সবকিছুই ইহুদি ধর্ম পিছু ফিরে দেখেছে উচ্ছেদ, যাযাবর হওয়া ও প্রত্যাবর্তন করার আলোকে' (পৃ. ১২৯)।

স্যান্ড বলছেন, 'যে ঐতিহাসিক ঘটনা দৃশ্যত ৭০ শতকে "দ্বিতীয় নির্বাসন" ঘটায়, সেই ঘটনার নিবিড় নিরীক্ষণ এবং হিব্রু অভিধা গোলাহ (নির্বাসন) ও পরবর্তী সময়ে হিব্রুতে এর সম্পৃক্তি বিশ্লেষণ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে (ইহুদিদের) জাতীয় ঐতিহাসিক সচেতনতা ছিল প্রথাগত বিভিন্ন উপাদান ও বিভিন্ন বৈসাদৃশ্যমূলক ঘটনার একটি গাঁথুনি। একমাত্র এই উপায়ে এটি একটি সফল মিথ হিসেবে কাজ করেছে, যা কিনা আধুনিক ইহুদিদের একটি জাতিগত পরিচয়ের পথ করে দিয়েছে। একটি কল্পিত, নির্বাসিত জাতিগোষ্ঠীকে সাবেক "বাইবেলের সম্প্রদায়ের" প্রত্যক্ষ বংশধর হিসেবে বর্ণনা করার সুদীর্ঘ স্মৃতিকথা বিনির্মাণের জন্য নির্বাসনের এই চরম ধারণা খুব প্রয়োজন ছিল। আমরা দেখব যে উৎখাত ও নির্বাসনের পুরাকথা আসলে খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে, যা কিনা ইহুদি ঐতিহ্যের ওপর প্রবাহিত হয়েছে এবং সাধারণ ও জাতীয় ইতিহাসে প্রোথিত সত্য হিসেবে বিকশিত হয়েছে' (পৃ. ১৩০)।

বাইবেল অনুসারে হিব্রুদের নিষ্ক্রমণ ঘটেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১৩ শতকে। এ বিষয়ে স্যান্ড বলছেন, মোজেস হিব্রুদের মিসর থেকে বের করে তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যেতে পারেননি, কেননা, ওই প্রতিশ্রুত ভূমিও ছিল মিসরীয় ভূখণ্ড। তিনি আরও বলেন যে ফারাও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাস বিদ্রোহ বা বাইরে থেকে এসে কেনান দখল করার কোনো ঘটনা ঘটেছে এমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না; এমনকি ডেভিড ও সলোমনের সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের কোনো চিহ্নও মেলে না। বরং সাম্প্রতিক আবিষ্কার ওই সময়কালে দুটি ছোট রাজ্যের অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছে। একটি হলো অধিকতর শক্তিশালী ইসরায়েল, অপরটি হলো জুদা, যা পরবর্তীকালে হয় জুদেয়া। স্যান্ড দাবি করছেন যে জুদার সাধারণ জনগণ খ্রিষ্টপূর্ব ছয় শতকে কোনো নির্বাসনে যায়নি, কেবল সম্ভ্রান্ত রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা ব্যাবিলনে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এর ফলে পারসিক ধর্মের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় ইহুদি একেশ্বরবাদের উত্থান ঘটে। স্যান্ড এ-ও দেখাচ্ছেন যে '৭০ সালে রোমানদের দ্বারা ইহুদিদের নির্বাসিত হওয়া ও ছড়িয়ে পড়ার (ইহুদি ডায়াসপোরা) মতো ইহুদি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিষয়ে কোনো প্রকৃত গবেষণা হয়নি। বরং খুব স্বাভাবিক কারণেই রোমানরা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তট থেকে কখনোই কোনো জাতিকে কোথাও নির্বাসনে পাঠায়নি। বন্দী দাসদের বাদ দিলে জুদার জনসাধারণ বরাবরই তাদের ভূমিতে বসবাস করে গেছে, এমনকি জেরুজালেমের দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংসের পরও। চার শতকে এসে অনেকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে আর সপ্তম শতাব্দীতে আরবদের বিজয়াভিযানের পর বেশির ভাগই ইসলাম গ্রহণ করে।

স্যান্ড তাঁর পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে বেশির ভাগ জায়নবাদী নেতা এসব বিষয় ভালোভাবেই জানতেন। ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়ন ও ইসরায়েলের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি আইজ্যাক বেন-জেভি ১৯২৯ সালের শেষভাগে এটি স্বীকার করেছিলেন। সে বছরই ফিলিস্তিনিদের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল।[৩০] দুজনেই বিভিন্ন সময়ে এমন কথাও বলেছেন যে ফিলিস্তিনের সাধারণ কৃষকেরাই প্রাচীন জুদার অধিবাসীদের বংশধর। তাঁরা দুজন নিউইয়র্কে থাকার সময় ১৯১৮ সালে এরেৎস[৩১] *ইসরায়েল ইন দ্য পাস্ট অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্ট* নামে হিব্রু ভাষায় যে বইটি রচনা করেন, সেখান থেকে উদ্ধৃত করেছেন স্যান্ড তাঁর বইয়ে, 'যেসব আরব সতেরো শতকে এরেৎস ইসরায়েল ও সিরিয়া দখল করেছিল, ফেল্লাহিনরা (আরব কৃষক) সেসব আরব বিজয়ীর বংশধর নয়। এ দেশে আরব বিজয়ীরা যে কৃষিভিত্তিক জনগোষ্ঠী পেয়েছিল, তারা তা ধ্বংস করেনি। তারা শুধু বহিরাগত বাইজান্টাইন শাসকদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। স্থানীয় জনগণের ওপর হাত তোলেনি। আবার আরবরা কোনো বসতি স্থাপনও করেনি। এমনকি তাদের সাবেক দখলকৃত ভূমিতে তারা কৃষিকাজেও লিপ্ত হয়নি। ...তারা কোনো নতুন জমি দাবি করেনি,

যেখানে তাদের প্রজাদের বসতি গড়া হবে, যদিও সে রকম কোনো প্রজা ছিল না। এসব নতুন দেশে তাদের স্বার্থের জায়গা ছিল রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও বস্তুগত : শাসন করা, ইসলামের প্রসার ঘটানো ও কর আদায় করা' (পৃ. ১৮৫)।

স্যান্ড জানাচ্ছেন যে বেন গুরিয়ন ও বেন-জভি, অন্তত প্রথম দিকে, আদিবাসী ফিলিস্তিনিরা জাতিগত আত্মীয় মনে করত, যারা কিনা এই মাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ও ইহুদিদের সম্ভাব্য জ্ঞাতি ভাই। তাঁরা দুজন ইসলামকে একটি বন্ধুসুলভ গণতান্ত্রিক ধর্ম বলেও মনে করেছেন। কিন্তু ১৯৩৬ সালের পর থেকে তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ফিলিস্তিনিদের জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্ন[৩২] করা বেন গুরিয়নের কাছে অনেক বেশি আবেদনময় মনে হয়েছিল।

'নির্বাসনের উদ্ভাবন : ধর্মান্তরীকরণ ও রূপান্তর' শীর্ষক এই অধ্যায়ে স্যান্ড বিভিন্ন ইতিহাস ও গবেষণা থেকে পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি তুলে ধরে দেখিয়েছেন, 'যখন ব্যাবিলনে ইহুদি কেন্দ্রগুলোর পতন ঘটেছিল, তখন ইহুদিরা বাগদাদে অভিবাসী হয়েছিল, জেরুজালেমে নয়, যদিও দুই শহর একই খিলাফতের অধীনে শাসিত ছিল। স্পেন থেকে বিতাড়িত ইহুদিরা ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী সব শহরেই অভিবাসী হয়েছিল, কিন্তু খুব সামান্যই জায়নে গিয়েছিল। আধুনিক যুগে নৃশংস সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও পূর্ব ইউরোপে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের উত্থানের ফলে ইদ্দিশ জনগণের বিরাট অংশই পশ্চিমে প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়েছে। ১৯২০-এর দশকে যখন আমেরিকা সীমান্ত বন্ধ করে দেয়, কেবল তখনই আর তারপর নাৎসি বাহিনীর ভয়াবহ গণহত্যা চালানোর ফলে বিরাটসংখ্যক (ইহুদি) অভিগমন করে ম্যান্ডেটরি ফিলিস্তিনে, যার অংশবিশেষ কিনা পরে ইসরায়েল রাষ্ট্র হয়। ইহুদিরা জোর করে তাদের "স্বদেশ" থেকে কখনোই বিতাড়িত হয়নি এবং তাদের সেখানে "স্বেচ্ছায়" কোনো প্রত্যাবর্তনও হয়নি' (পৃ. ১৩৭)।

পাঁচ.

নির্বাসন ও বিতাড়ন তত্ত্ব নাকচ হয়ে গেলে জায়নবাদী ইহুদিদের জন্য খুব সমস্যা হয়ে যায়। আর তখনই প্রশ্ন আসে যে তাহলে ইউরোপ, আফ্রিকা ও আরব দেশগুলো থেকে ইসরায়েলে ফিরে আসা ইহুদিরা আসলে কারা? এদের পূর্বসূরিরা যদি গণহারে নির্বাসনেই না গিয়ে থাকে, তাহলে কীভাবে এরা বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল?

শ্লোমো স্যান্ড এ রকম নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন বইটির চতুর্থ অধ্যায়ে যার শিরোনাম, 'নীরবতার রাজ্য : (ইহুদিদের) হারানো সময়ের সন্ধানে'। এককথায় এসব প্রশ্নের তাঁর উত্তরটা এ রকম, 'ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকজন ছড়িয়ে পড়েনি, কিন্তু ইহুদি ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। ইহুদিবাদ ছিল একটি রূপান্তরকামী ধর্ম। প্রচলিত জনমতের বিপরীতে প্রকৃত ঘটনা হলো ইহুদিবাদের সূচনালগ্নে অন্যদের এই ধর্মে

রূপান্তরের প্রবল বাসনা ছিল।'[৩৩] অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে অন্য ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষ ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছে, আবার তাদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তিনি বলছেন যে খ্রিষ্টবাদের উত্থানের আগ পর্যন্ত ইহুদিবাদে ধর্মান্তঃকরণের প্রয়াস, বিশেষ করে যেসব স্থানে একেশ্বরবাদের কোনো ছোঁয়া ছিল না, সেসব স্থানে বেশ জোরদার ছিল। তাঁর ভাষায়, 'আরব উপদ্বীপ থেকে স্লাভ ও ককেশাস হয়ে ভোলগা ও ডন নদীর মধ্যবর্তী স্তেপভূমিতে, ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পুনর্নির্মিত কারথেজে ও তার আশপাশে এবং প্রাক্-মুসলিম আইবেরীয় উপদ্বীপে ইহুদিবাদ ক্রমাগত বিশ্বাসীদের কাছে জায়গা করে নিয়েছিল, যা কিনা ইতিহাসে তার চিত্তাকর্ষক স্থান নিশ্চিত করেছে। গোত্রীয় পর্যায় থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে বিন্যস্ত রাষ্ট্র হওয়ার এক ক্রান্তিকালে এসব অঞ্চলের সংস্কৃতিতে এটা উপস্থিত হয়েছিল আর অবশ্যই এসব ছিল পুরোপুরি পৌত্তলিক' (পৃ-১৯০)। আরবভূমিতে ইহুদিবাদের বিস্তার নিয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, 'ইহুদি একেশ্বরবাদের বিস্তার, যা তখনো রাবাইদের নিয়ন্ত্রণে যায়নি, অবশ্যই ইসলামের উত্থানের আধ্যাত্মিক ভূমি গঠনে সাহায্য করেছে। যদিও নতুন ধর্ম তার অগ্রদূতের সঙ্গে তীব্র সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল, তারপরও ইহুদিবাদের আদর্শিক প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের বিষয়ে কোরআন সাক্ষ্য দিয়েছে' (পৃ. ১৯১)।

স্যান্ড এ-ও দেখাচ্ছেন যে চার শতকে খ্রিষ্টবাদের জয়গাথা ইহুদিদের সম্প্রসারণকে রুদ্ধ না করলেও তাকে খ্রিষ্টীয় সাংস্কৃতিক জগতের প্রান্তসীমায় নামিয়ে নিয়ে আসে। পঞ্চম শতকে হিমইয়ারে (আজকের আধুনিক ইয়েমেন) একটি সবল ইহুদি রাজ্য গড়ে ওঠে, যার অধিবাসীরা ইসলামের বিজয়াভিযান চলাকাল থেকে বর্তমান সময়ে এসেও নিজেদের বিশ্বাস বজায় রেখেছে। আরব ধারাভাষ্য জানায়, সাত শতকে একটি ইহুদি বারবার গোত্রের কথা জানায়; আর ওই শতকের শেষ দিকে ইহুদি রানি দিহইয়া উত্তর-আফ্রিকায় আরবদের অভিযান রুখে দিয়েছিলেন, এমন কিংবদন্তিও আছে। ইহুদি বারবাররা (স্পেনে) আইবেরীয় উপদ্বীপ বিজয়াভিযানে অংশ নিয়েছিল। তারা সেখানে ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা স্থাপনে সহায়তা করেছিল, যা কিনা হিস্পানো-আরবি সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা রাখে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণধর্মান্তঃকরণ ঘটেছিল আট শতকে, কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী খাজার রাজ্যে। ইহুদিবাদের সম্প্রসারণ ককেশাস থেকে আধুনিক ইউক্রেন পর্যন্ত বিভিন্ন গোত্রের একটি বহুত্ব তৈরি করেছিল, যাদের অনেকগুলোই তেরো শতকে পূর্ব ইউরোপে মোঙ্গল অভিযানকালে পিছু হটেছিল। সেখানে ইহুদিরা স্লাভ ভূমি থেকে দক্ষিণে এবং বর্তমান জার্মানিতে ইয়াদ্দিশ সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে তুলেছিল।[৩৪]

জায়নবাদীরা স্যান্ডের ওপর সবচেয়ে ক্রুদ্ধ হয়েছে খাজারীয় ইহুদি ও ইডিশ সংস্কৃতিকে বর্তমান ইহুদিদের, বিশেষ করে আশকেনাজি ইহুদিদের পূর্বপুরুষ ও

ঐতিহ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে। বলা দরকার যে ইসরায়েলে প্রধানত তিন ধরনের ইহুদির বসবাস। তারা হলো আশকেনাজিক, মিজরাহি ও সেফারদিক। এদের মধ্যে আশকেনাজিরা হলো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তারা ইসরায়েলের মোট ইহুদির প্রায় ৪৮ শতাংশ (আর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৬ শতাংশ)। হিব্রু ভাষায় আশকেনাজি বলতে জার্মানি ও উত্তর ফ্রান্সের ইহুদিদের বোঝায়। সেফারদিক বলতে বোঝায় স্পেন ও আইবেরিয়া উপদ্বীপ থেকে আগত ইহুদিদের। আর মিজরাহি হলো প্রাচ্যের ইহুদি, যারা মূলত বিভিন্ন আরব দেশে বসবাস করত। তবে ইসরায়েল আশকেনাজি ও সেফারদিকদের পশ্চিমের ইহুদি আর মিজরাহিদের পূর্বের ইহুদি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই পূর্ব ও পশ্চিমের বিভাজনটা আবার প্রচ্ছন্নভাবে ধর্মভিত্তিক। পশ্চিমা ইহুদি হলো যারা খ্রিষ্টান ইউরোপের অধিবাসী, বিশেষ করে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের। অন্যদিকে পূর্বের ইহুদিরা হলো যারা মূলত ইসলামি জগতে বাস করত। বিশেষ করে ইরাক, ইরান ও ইয়েমেনে। আবার সেফারদিকদেরও পূর্বের ইহুদি বলা হয়। বর্তমান ইসরায়েলে আশকেনাজি ও মিজরাহি ইহুদিদের মধ্যে বড় ধরনের দ্বন্দ্ব রয়েছে। আশকেনাজিরা নিজেদের উচ্চবর্ণের ও সম্ভ্রান্ত ইহুদি মনে করে। তাদের গায়ের রং ফরসা বা উজ্জ্বল, দেখতেও তারা সুশ্রী। আর মিজরাহিরা শ্যামবর্ণের, দেখতে অত সুশ্রী নয়। বর্ণভেদ প্রথা সূক্ষ্মভাবে ইসরায়েলের গোড়া থেকে প্রোথিত। আশকেনাজিরা নিজেদের তুলনায় মিজারাহিদের হীন বা ছোট জাতের মনে করে, তাদের এশীয় বলে থাকে।[৩৫]

স্যান্ড বলছেন, 'সনাতন জায়নবাদী ইতিহাসবিদেরা বরাবরই বলে এসেছেন যে পূর্ব ইউরোপের ইহুদিরা এসেছে জার্মানি থেকে (তার আগে তারা "কিছু সময়" রোমে অবস্থান করেছিল, আর সেখানে তারা এসেছিল "ইসরায়েলের ভূমি" থেকে বিতাড়িত হয়ে)। ইউরোপের পশ্চাৎপদ অঞ্চলের নিম্ন মর্যাদাকে ছাপিয়ে নির্বাসন ও যাযাবর জনগোষ্ঠীর আবশ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জার্মানির মতো "সভ্য" দেশের সম্মান বড় হয়ে ওঠে (আরব দেশগুলোর ইহুদিরা নিজেদের যে রকম সেফরদিক বলে অভিহিত করে থাকে, তেমনি পূর্ব ইউরোপের ইহুদিরা নিজেদের আশকেনাজি বলতে পছন্দ করে)।[৩৬] যদিও কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, যা দেখায় যে ইহুদিরা জার্মানির পশ্চিমাঞ্চল থেকে মহাদেশের পূর্ব দিকে অভিবাসী হয়েছিল, ঘটনা হলো পোল্যান্ড, লিথুনিয়া ও রাশিয়ার ইহুদিরা ইদ্দিশ ভাষায় কথা বলত, যা সম্ভবত প্রমাণ করে যে পূর্ব ইউরোপের ইহুদিরা ছিল প্রকৃত জার্মান ইহুদি—আশকেনাজি ইহুদি। যখন এসব ইহুদির ভাষার ৮০ শতাংশ শব্দই ছিল জার্মানীয়, তখন কী করে এটা সম্ভব হলো যে খাজার ও সব ধরনের স্লাভ, যারা আগে তুর্কি বা স্লোভানীয় ভাষায় কথা বলত, তারা ইডিশে কথা বলতে লাগল?' (পৃ. ২৪৩)।

খাজাররা কেন ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মোটাদাগে বলা হয় যে একদিকে অর্থোডক্স বাইজান্টানীয় খ্রিষ্টান সাম্রাজ্য, অন্যদিকে আব্বসীয় মুসলমান খিলাফত—এই দুই শক্তির চাপের মুখে খাজাররা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করাকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নেয়। ইসলাম গ্রহণ করলে খিলাফতের অধীনে, আর খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলে বাইজান্টানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে বিলীন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনো একটি ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া প্যাগান খাজারদের কোনো উপায় ছিল না। এ রকম অবস্থায় ইহুদি ধর্মকে বেছে নেয় তারা। যেহেতু তিনটিই একেশ্বরবাদী ধর্ম, তাই একধরনের সমঝোতা করে চলার পথ তৈরি হয়। তবে দশ শতকে রুশ আক্রমণের মুখে খাজার রাজ্যের পতন ঘটলে সেখান থেকে অনেক ইহুদি পূর্ব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এদের উত্তরসূরিরা কালক্রমে আশকেনাজি ইহুদি হিসেবে দেখা দেয় বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু জায়নবাদীসহ বেশির ভাগ ইহুদি ও খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদ ও গবেষক এই ধারণা সমর্থন করেন না। তাঁরা এগুলোকে মিথ বা পুরাকথা বা কল্পকাহিনি বলে অভিহিত করেন। এ প্রসঙ্গে স্যান্ড বলছেন, 'কী কারণে ইহুদি ইসরায়েলি স্মৃতিতে এ বিষয়ে (খাজারীয় ইহুদি) নীরবতা নেমে এসেছিল? প্রথাগত জাতিগত গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাটি সব সময় ইহুদি জাতীয়তাবাদে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তবে এর বাইরে দুটি সম্ভাব্য কারণ রয়েছে। প্রথমটি হলো, ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে বি-উপনিবেশীকরণের জোয়ারে ইসরায়েলি স্মৃতি-সওদাগরেরা খাজারীয় অতীতের সবকিছু এড়িয়ে গিয়েছিল। জায়নবাদী প্রকল্পের বৈধতা নিয়ে উদ্বেগ ছিল। যদি ব্যাপকভাবে জানাজানি হতো যে দলে দলে বসতি স্থাপনকারী ইহুদিরা "ইসরায়েলের সন্তানদের" সরাসরি বংশধর নয়, তাহলে এই অবৈধতা ইসরায়েল রাষ্ট্রের টিকে থাকার অধিকারের প্রতি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিত। আরেকটি সম্ভাব্য কারণ (যা প্রথমটির সঙ্গে বিরোধপূর্ণ নয়) হলো, বিরাট ও ঘনবসতিপূর্ণ ফিলিস্তিন ভূখণ্ডসমূহে দখলদারত্ব ইসরায়েলি পরিচয়ের রাজনীতিতে জাতিগত উপাদান জোরদার করেছিল। ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে নৈকট্য কল্পিত "জাতীয়" ইসরায়েলের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয় এবং এর পরিচয় ও সংজ্ঞার মধ্যে জোরদার বন্ধনের দাবি জানায়। ফলে খাজারবিষয়ক যেকোনো কিছুকে একেবারে চুকিয়ে ফেলা হয়। বিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এতিম খাজারদের সঙ্গে সংযোগ ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে, যখন কিনা "ইহুদি সম্প্রদায়" দুই হাজার বছরের যাযাবরত্ব ঘুচিয়ে আবার তাদের আদি "স্বদেশে" একত্র হয়েছে' (পৃ. ২৩৬)।

ছয়.

শ্লোমো স্যান্ডের নিবিড় গবেষণামূলক বইটি থেকে যেসব উপসংহারে পৌঁছানো যেতে পারে, তা সংক্ষেপে এ রকম : (ক) হিব্রু তথা ইহুদিরা ঈশ্বরের মনোনীত

সম্প্রদায় আর তাদের জন্য ঈশ্বর সুনির্দিষ্ট ভূমির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—এসব মূলত বাইবেলভিত্তিক পুরাকথা; (খ) প্রাচীন ভূমি ইসরায়েল ও জুদা থেকে হিব্রুরা কখনো গণহারে বিতাড়নের শিকার হয়ে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়নি এবং কথিত এই বিতাড়ন ও নির্বাসনের সপক্ষে জোরালো ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই; (গ) যেহেতু ইহুদিদের পূর্বপুরুষেরা কখনো গণহারে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়নি, সেহেতু তাদের কথিত উত্তরসূরিদের এই ভূমিকে নিজ ভূমি দাবি করে ইসরায়েলে ফিরে আসার কোনো যৌক্তিকতা নেই; (ঘ) ইহুদিরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যুগের পর যুগ ধরে বংশপরম্পরায় বসবাস করে এসেছে ও আসছে এবং একমাত্র ধর্মবিশ্বাসই তাদের মাঝে একতার মেলবন্ধন তৈরি করেছে, অন্য কিছু নয়; (ঙ) শুধু ধর্মবিশ্বাসের ঐক্য নিয়ে একটি জাতি বা সম্প্রদায় গঠিত হতে পারে না আর তাদের কোনো স্বতন্ত্র দেশ বা রাষ্ট্র থাকতে পারে না; (চ) ইসরায়েল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার অধিকার রাখে। তবে সেখানে অবশ্যই সব অধিবাসী তথা নাগরিকের সমানাধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়, শুধু ইহুদিদের জন্য জাতিরাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েল গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য, নয় বছর আগে প্রকাশিত বইটিতে লেখক যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা-ই সত্যি হয়েছে। ২০১৮ সালের ২০ জুলাই ইসরায়েলের সংসদ (নেসেট) ৬২-৫৫ ভোটে জাতিরাষ্ট্র বিলটি অনুমোদন করার মধ্য দিয়ে ইসরায়েল শুধু ইহুদিদের দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবিধানিক ও আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে ইসরায়েল রাষ্ট্র ১৯৪৮ সালে ১৪ মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বাধীনতার ঘোষণার ওপর যেখানে একটি 'ইহুদি ও গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। তখন কোনো সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব ছিল না, আর আজও দেশটির কোনো লিখিত সংবিধান নেই। সংবিধানের বদলে স্বাধীনতার ঘোষণার আলোকে কিছু মৌলিক আইন দিয়ে পরিচালিত হয় দেশটি। সাত দশক ধরে পুরোপুরি ইহুদি রাষ্ট্র বানানোর সর্বাত্মক প্রয়াসটি এই 'জাতিরাষ্ট্র' শিরোনামে আরেকটি মৌলিক আইন গ্রহণের মধ্য দিয়ে আরও জোরদার হলো। এর ফলে হিব্রু হলো একমাত্র সরকারি ও রাষ্ট্রীয় ভাষা, আরবি আর দ্বিতীয় সরকারি ভাষা রইল না। ইসরায়েলি আরবরা হলো দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক, যারা কিনা দেশটির মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ। অথচ সারা বিশ্বের সব ইহুদির জন্য ইসরায়েলের দ্বার খোলা রইল। ইসরায়েলকে ইহুদিদের ঐতিহাসিক জন্ম হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হলো। পূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ জেরুজালেমকে এই রাষ্ট্রের রাজধানী করা হলো। সব মিলিয়ে জায়নবাদীরা ইসরায়েলকে একটি চরম সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা করল। আর তা করা হলো সেসব পুরাকথা ও অর্ধসত্যের ভিত্তিতে, যেগুলো শ্লোমো স্যান্ড তাঁর বইয়ে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১. ইংরেজি People (পিপল) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে এখানে সম্প্রদায় ব্যবহার করাকে অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে, যদিও পিপল শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় জনগণ অধিক প্রচলিত। আরেকটি প্রতিশব্দ আছে, যা হলো জনসমাজ। এটি কম প্রচলিত তবে পারিভাষিক অর্থে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সম্প্রদায় বলতে মোটাদাগে সামাজিক প্রথা, মূল্যবোধ, ধর্ম ও পরিচয়ে মিল রয়েছে এমন কোনো ছোট বা বড় জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়। এই নিবন্ধে কখনো কখনো সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠী একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, আবার কখনো জনসমাজও ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, জনসমাজের ধারণা হলো মোটামুটি একই ধরনের জীবনধারায় অভ্যস্ত এক মানবসমষ্টির ধারণা।

২. Zionism বা জায়নবাদ হলো ইহুদিদের কথিত নিজ আদি বাসভূমিতে ফিরে যাওয়া ও সেখানে সার্বভৌম ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। জায়নবাদের অনুসারী ও সমর্থকদের বলা হয় জায়নবাদী। ইহুদি ছাড়াও খ্রিষ্টানদের মধ্যে অনেক জায়নবাদী আছেন, যাঁরা কিনা ইহুদিদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবির সপক্ষে অবস্থান নেন এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন দেন।

৩. হিব্রু বাইবেল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই নিবন্ধের তৃতীয় ভাগে।

৪. হিব্রুভাষী জনগোষ্ঠী যারা কালক্রমে ইহুদি ধর্মাবলম্বী হয়ে ওঠে।

৫. Anti-Semitic.

৬. শচীন চট্টোপাধ্যায়, (২০১৬); পৃ. ১১২।

৭. Shlomo Sand, (2008)

৮. Shaul Bartal, (2015)

৯. The Invention of the Jewish People.

১০. ডায়াসপোরা বা নির্বাসিত হওয়া।

১১. D. Karpel, (2012).

১২. Introductions: Burdens of Memory.

১৩. Making Nations: Sovereignty And Equality.

১৪. Mythistory: In The Beginning, God Created The People.

১৫. The Invention Of The Exile: Proselytism And Conversion.

১৬. Realms of Silence: In Search of Lost (Jewish) Time.

১৭. The Distinction: Identity Politics In Israel.

১৮. মাসুদ রানা, (২০১৫)।

১৯. মাসুদ রানা, (২০১৫)।

২০. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, (১৯৯৭), পৃ. ১০৯, ।

২১. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, (১৯৯৭)।

২২. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, (১৯৯৭)।

২৩. John Drane, (2011).

২৪. John Drane, (2011).

২৫. John Drane, (2011).

২৬. John Drane, (2011).

২৭. Rabbinical Judaism বা পুরোহিততান্ত্রিক ইহুদিবাদ। এটি গড়ে উঠেছে 'দ্বৈত তোরা' বিশ্বাসের ওপর যেখানে মনে করা হয় মোজেসের ওপর সিনাই উপত্যকায় লিখিত ও মৌখিক দুভাবে তোরা অবতীর্ণ হয়েছিল। মৌখিক বলতে পুরাকালের নবীদের ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মাধ্যমে। আর রাবাইরা একমাত্র তোরার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ার অধিকারী।

২৮. Avnery, Uri. (2018a).

২৯. Great Exodus

৩০. ব্রিটিশদের নানা ধরনের অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের কারণে ১৯২৯-৩০ সালে আরবরা একবার ছোটখাটো একটা বিদ্রোহ করে। তবে ১৯৩৬-৩৯ সময়কালের দ্বিতীয় ও বড় ধরনের বিদ্রোহটি ব্রিটিশরাজকে শঙ্কিত করে। তাই তারা নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে আর অনেক ফিলিস্তিন নেতাকে দেশছাড়া করে। আর এই গোলযোগের মধ্যেই পিল কমিশন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের একটি ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করে সেখানকার আরবদের পূর্বে ট্রান্স জর্ডান ও পশ্চিমে মিসর-সংলগ্ন বৃহত্তর অংশে স্থানান্তরের প্রস্তাব দেয়। পিল কমিশনের প্রস্তাবে জেরুজালেম ও বেথেলহামকে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটি ছিটমহল হিসেবে রাখার কথাও বলা হয়। আরবরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও জায়নবাদী নেতারা এতে সমর্থন দেন। কেননা, এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের একটি ভিত্তি রচিত হয়ে যায়।

৩১. এরেৎস হিব্রু শব্দ যার মানে ভূমি

৩২. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইসরায়েলি ইতিহাসবিদ ইলান পেপের *দ্য এথনিক ক্লিনজিং অব প্যালেস্টাইন* বইয়ের আলোচনা দেখুন *প্রতিচিন্তার* জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭ সংখ্যায়।

৩৩. Gilad Atzmon, (2009).

৩৪. Shlomo Sand, (2008).

৩৫. Uri Avnery, (2018a).

৩৬. স্যান্ড তাঁর বইয়ে আশকেনাজি ও সেফারদিক—এই দুই শ্রেণির ইহুদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মিজরাহি ইহুদিদের আলাদা শ্রেণি হিসেবে বিবেচনায় নেননি এবং মিজরাহিদের সেফারদিকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

Atzmon, Gilad (2009). The Wandering Who? Available at: http://www.gilad.co.uk/writings/shlomo-sands-the-invention-of-the-jewish-people-book-review.html Avnery, Uri. (2018a). Why I am Angry. [online] www.counterpunch.org. Available at: https://www.counterpunch.org/2018/01/08/why-i-am-angry/ [Accessed 10 May 2018].

Avnery, Uri. (2018b). Who the Hell Are We?. [online] www.counterpunch.org. Available at: https://www.counterpunch.org/2018/08/06/who-the-hell-are-we/

Bartal, Shaul. (2015). Shlomo Sand, The Arabs' Darling. *Middle East Quarterly* Winter 2015 Volume 21: Number. Available at: https://www.meforum.org/articles/2014/shlomo-sand,-the-arabs-darling

Drane, John (2011). The Bible. [online]

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/texts/bible.shtml

Hadar, Leon T. (2010) Book Review: The Invention of the Jewish People. Available at:
https://www.cato.org/publications/commentary/book-review-invention-jewish-people

Joe Friendly. 2009. Shlomo Sand: Challenging notions of a Jewish People. [online video] available at:
https://www.youtube.com/watch?v=1EmvANgw9Mk [Accessed June 24, 2018].

Karpel, D. (2012). Author of 'The Invention of the Jewish People' vents again. [online] haaretz.com. Available at:
https://www.haaretz.com/.premium-author-of-the-invention-of-the-jewish-people-vents-again-1.5162576 [Accessed 17 Apr. 2018].

Rossixstudio. 2012. Shlomo Sand - The invention of the jewish people. [online video] available at:
https://www.youtube.com/watch?v=TX_xXMsg9BI [Accessed May 22, 2018].

Sand, Shlomo. (2008). Israel deliberately forgets its history. [online] Le Monde diplomatique. Available at:
https://mondediplo.com/2008/09/07israel [Accessed 24 Apr. 2018].

Sand, Shlomo. (2009). The Invention of the Jewish People; Verso, London, 2010..

Soteri, Nicolas (1995). Khazaria: A Forgotten Jewish Empire. [online] History Today Volume 45 Issue 4 April 1995. Available at:
http://www.historynotes.info/khazaria-a-forgotten-jewish-empire-1228/

Strenge, Carlo. (2009). *Shlomo Sand's 'The Invention of the Jewish People' is a success for Israel*. [online] haaretz.com. Available at:
https://www.haaretz.com/1.5139766 [Accessed 16 Apr. 2018].

রানা, মাসুদ (২০১৫)। সাম্প্রদায়িকতার ডিকনস্ট্রাকশন : ঐতিহাসিক স্বরূপ ও বিভ্রান্তি। [অনলাইন]

http://portal.ukbengali.com/columns/সাম্প্রদায়িকতার ডিকনস্ট্রাকশন : ঐতিহাসিক স্বরূপ ও বিভ্রান্তি

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন (১৯৯৭)। *রাজনীতির অভিধান*; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

চট্টোপাধ্যায়, শচীন (২০১৬)। *প্রাচীন প্যালেস্টাইন*; অরিত্র, ঢাকা, ২০১৬।

সেনগুপ্ত, অমিতাভ (২০১৫)। *ইহুদিকথা*; রূপালী, কলকাতা, ২০১৫।

বই আলোচনা

ফারাক নির্মাণের রাজনীতি ও বিউপনিবেশায়ন ভাবনা

সামজীর আহমেদ

ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন ও সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা
সৈয়দ নিজার, চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, ২০১৭।

পিয়েরে বরদু তাঁর *Distinction* গ্রন্থে বলেন, "… art and cultural consumption are predisposed, consciously and deliberately or not, to fulfil a social function of legitimating social differences." (Bourdieu 1996 : 07)। বরদু তাঁর গ্রন্থে দাবি করেছেন যে রুচি, বিশেষ করে শিল্প উপভোগের রুচির ভিন্নতা শ্রেণি-পার্থক্য তৈরি করে এবং শ্রেণি-পরিচয় নির্মাণ করে। শ্রেণি-পরিচয় নির্মাণ, বিশেষত শ্রেণির উচ্চতা, উৎকর্ষ নির্মাণ ও রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সহায় হচ্ছে শিল্পভোক্তার রুচি। ফলে রুচি সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়নক। এই রুচিবোধের মাধ্যমেই নির্মিত হয় শ্রেণিব্যবধান, যা কোনো শ্রেণিকে উচ্চতর আবার কোনো শ্রেণিকে নিম্নতর হিসেবে উপস্থাপন করে। বরদুর আলোচনা সামাজিক শ্রেণিগুলোর ব্যবধানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও তাঁর 'রুচি ও ফারাক নির্মাণ'-এর ধারণা উপনিবেশক ও উপনিবেশিত—এ দুই শ্রেণির জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ উপনিবেশক যখন উপনিবেশিতের অঞ্চল দখল করে এবং তার শাসনকে নৈতিকভাবে সিদ্ধ করে তুলতে চায়, তখন তার জন্য জরুরি হয়ে পড়ে নিজের উৎকর্ষ ও অধীনস্থের অধস্তনতা নির্মাণের। আর এটা করার সবচেয়ে সোজা ও কার্যকর উপায় হচ্ছে রুচির উৎকর্ষ প্রদর্শন ও 'ফারাক নির্মাণ'। সৈয়দ নিজারের *ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন ও সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা* গ্রন্থে মূলত উঠে

এসেছে এই ফারাক নির্মাণের রাজনীতি এবং এর বিরুদ্ধাচরণও কীভাবে ফারাকটিকেই আরও শক্তিশালী করে তুলেছে তার ইতিহাস। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে লেখক সুলতানকে উপজীব্য করে ইঙ্গিত করেছেন কীভাবে এই উপনিবেশকের রাজনীতি থেকে বের হয়ে বি-উপনিবেশিত আত্মপরিচয় নির্মাণ করা যায়। ফলে গ্রন্থটি ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন ও বি-উপনিবেশায়নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও এটি মূলত বি-উপনিবেশিত আত্মপরিচয় নির্মাণের জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রয়াস বা কীভাবে বি-উপনিবেশায়ন সম্ভব তার ইঙ্গিত।

লেখক বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন :

> রেনেসাঁ এবং পরবর্তী কয়েক শ বছর ইউরোপীয় চিন্তক এবং দার্শনিকগণ মনে করতেন শিল্পের অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে তার বাস্তবতাকে উপস্থাপনের ক্ষমতা। প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতীয় চিত্রকলা রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর না হওয়ার কারণে বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনের ক্ষমতা তার নেই। এই যুক্তিতে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে ভারতীয় চিত্রকলা উপস্থাপিত হয়েছে 'CRAFT' হিসেবে, 'FINE ART' হিসেবে নয়, যা জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈধতা দিয়েছে ঔপনিবেশিক উন্নয়ন প্রস্তাবের (নিজার ২০১৭ : ০৮)।

অর্থাৎ, যে ফারাক শ্রেণিগত উৎকর্ষ নির্মাণ ও রক্ষার জন্য জরুরি তা শিল্পকলার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড নির্মাণ করেছিল বাস্তবতাকে উপস্থাপনের ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে এবং আরও নির্দিষ্ট করে বললে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশলের ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। এই ফারাক কেবল ইউরোপীয় শিল্পেরই উৎকর্ষ প্রমাণ করে না, তা ইউরোপের রুচি ও বরদুর সূত্রমতে ইউরোপের শ্রেণি বা জাতিগত উৎকর্ষও প্রমাণ করে। ফলে এ ক্ষেত্রে ভারতশিল্পের বি-উপনিবেশায়নের প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে এই নির্মিত ফারাকের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং কোন প্রক্রিয়ায় উপনিবেশায়ন ঘটেছিল, তা স্পষ্ট করে দেখানো। লেখক ঠিক এই কাজটিই করেছেন ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিল্পের অভিমুখিতার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে। তিনি দার্শনিক ঢঙে উপনিবেশকের দাবির জ্ঞানতাত্ত্বিক দাবি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন এবং দেখিয়েছেন ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিল্পের অভিমুখিতা ভিন্ন, আর তাই উভয়ের অঙ্কনকৌশলও ভিন্ন। ফলে তাদের মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষের তুলনা চলে না। কিন্তু এখানে যে ব্যাপারটি পরিষ্কার হওয়া সবচেয়ে জরুরি তা হচ্ছে, এই অভিমুখিতার ভিন্নতা কোনোভাবেই ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড যে ফারাক নির্মাণ করে তাকে সাহায্য করে না, বরং উপনিবেশকে বৈধতা দেওয়া সেই ফারাককে জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবেই ঘুচিয়ে দেয়। লেখক বেশ কিছু গ্রন্থ যেমন বিষ্ণুধর্মোত্তর *পুরাণ*, *পঞ্চদশী* ও *শকুন্তলা*র উদাহরণ টেনে দেখিয়েছেন ভারতীয় শিল্পকলাও প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলে বাস্তবতাকেই উপস্থাপন করতে চেয়েছে। পার্থক্য কেবল এখানেই যে বাস্তবতার উপস্থাপন বলতে ইউরোপীয়রা যা বুঝেছে,

ভারতীয়রা তা বোঝেনি। লেখকের মতে, ইউরোপীয়রা যে বাস্তবতার উপস্থাপনপ্রয়াসী, তা ব্যক্তিসাপেক্ষ এবং ভারতীয়রা যে বাস্তবতার উপস্থাপনপ্রয়াসী, তা ব্যক্তিনিরপেক্ষ। একটা উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটি স্পষ্ট করা যাক।

আমরা জানি, যেকোনো ট্রেনের সব বগিই সাধারণত একই আকারের হয়। কোনো বগির থেকে কোনো বগি ছোট বা বড় হয় না। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যে অবস্থান থেকেই ট্রেনটি দেখুক না কেন, সে সব বগি সমান দেখবে না। তার কাছে দৃষ্টির সব থেকে কাছের বগিটিকে সবচেয়ে বড় এবং সব থেকে দূরের বগিটিকে সবচেয়ে ছোট মনে হবে। আর এই দৃষ্টি সাপেক্ষে বড় থেকে ছোট হয়ে আসার প্রক্রিয়াটা হবে একবারে গাণিতিক। ইউরোপীয় চিত্রকলা মূলত এই দৃষ্টিকোণনির্ভর বাস্তবতাকে উপস্থাপন করেছে। আর যেহেতু এই দৃষ্টিকোণনির্ভর বাস্তবতার উপস্থাপন গাণিতিক নিয়ম মেনে সম্ভব, তাই রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপীয় চিত্রকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশলের ব্যবহার। অন্যদিকে ভারতীয় শিল্পকলায় উপস্থাপিত বাস্তবতা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, যা বস্তুর সামান্য বৈশিষ্ট্যের উপস্থাপনপ্রয়াসী। কারণ ভারতীয়রা মনে করেছে ব্যক্তিনিরপেক্ষ বস্তুর সামান্য চরিত্রের উপস্থাপনই বাস্তবতার উপস্থাপন। ফলে প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা যদি ট্রেন আঁকতেন, তবে ওই ট্রেনের সব কটি বগিই সমান হতো এবং তাতে উঠে আসত সব ট্রেনের সামান্য চিত্র।

লেখক ভারতশিল্পের অভিমুখিতা স্পষ্ট করতে গিয়ে শিল্পের ষড়াঙ্গ ধারণার উল্লেখ করেছেন। এই ষড়াঙ্গের প্রথম ধাপ হলো রূপভেদ, যা মূলত এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর পার্থক্যকে নির্দেশ করে। ষড়াঙ্গের দ্বিতীয় অঙ্গ হলো প্রমাণ। এই ধাপে বস্তুর আকার-আকৃতি সম্পর্কে জানা যায়, যা ওই বস্তু সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়। এরপর ষড়াঙ্গের তৃতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে 'ভাব', যা ইউরোপীয় শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের অভিমুখিতার পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে মিলগুলো লক্ষ করে সেই মিলগুলোর সমন্বয়ে যখন কোনো চিত্র পাওয়া যায়, তখন ওই চিত্র হয় ব্যক্তিনিরপেক্ষ এবং সার্বিক। ভারতীয় শিল্পদর্শনে একে বলা হয়েছে সামান্য লক্ষণ। আবার বস্তুর সামান্য বৈশিষ্ট্যের পর ওই বস্তুর সঙ্গে অপরাপর বস্তুর সম্পর্ক, অর্থাৎ ওই বস্তুর পরিবেশ-প্রতিবেশ-প্রেক্ষিত যখন নির্ণীত ও উপস্থাপিত হয়, তখন ভারতীয় শিল্পদর্শনে একে বলা হয় জ্ঞান লক্ষণ। এই সামান্য লক্ষণ ও জ্ঞান লক্ষণের যোগে সৃষ্টি হয় 'ভাব' এবং ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ভাবনির্ভরতা। যেহেতু রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশল দূরত্ব অনুসারে বস্তুর আকার ও উজ্জ্বলতা উপস্থাপন করতে পারে শুধু, কিন্তু বস্তুর সঙ্গে প্রতিবেশের সম্পর্ক উপস্থাপন করতে পারে না, সেহেতু ভারতশিল্পের অভিমুখিতা বিবেচনায় রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশল কখনো প্রয়োজনীয় হয়ে

ওঠেনি। এ ছাড়া এই কৌশলের প্রাসঙ্গিকতা ভারতশিল্পে না থাকার প্রায়োগিক কারণ হিসেবে লেখক উল্লেখ করেছেন এই অঞ্চলের গ্রীষ্মপ্রধান বৈশিষ্ট্যকে। সূর্যের আলোর তীব্রতা বেশি হলে দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে রঙের পরিবর্তন হয় না বলেই অনেকের অভিমত। ফলে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশলের প্রয়োজনীয়তা এই অঞ্চলের শিল্পীরা অনুভব করবেন না, এটাই স্বাভাবিক।

অন্যদিকে ইউরোপীয় চিত্রকলার ইতিহাসেও সামান্য লক্ষণনির্ভর চিত্রকর্ম পাওয়া যায়। দা ভিঞ্চির বিখ্যাত চিত্র 'ভিট্রুভিয়ান ম্যান' তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। লেখক এই চিত্রের সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার দেহ অঙ্কনের মূল ভিত্তি উত্তম নবতাল অনুসারে আঁকা মানবদেহের তুলনা করে দেখিয়েছেন, উভয় চিত্রের আদর্শ মানবদেহের আকার প্রায় সম্পূর্ণ মিলে যায়, যা প্রমাণ করে যে রেনেসাঁ-পূর্ব ইউরোপীয় শিল্প ও ভারতীয় শিল্পের অভিমুখিতা অভিন্ন। ফলে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড ভারতশিল্পের সঙ্গে ইউরোপীয় শিল্পের যে ফারাক নির্মাণ করে, তা জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবেই ভেঙে পড়ে। কারণ, সংক্ষেপে বললে এই উভয় ধারার শিল্পই বাস্তবতাকে উপস্থাপন করে, পার্থক্য শুধু ব্যক্তিসাপেক্ষ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ বাস্তবতার ধারণায় এবং বাস্তবতার ধারণার পার্থক্যের কারণে ভারতীয় শিল্পে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিতে কৌশলের প্রয়োজন হয়নি এবং এটা তার সামর্থ্যের প্রশ্ন নয় বরং প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন। উপরন্তু, উভয় ধারাতেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ সামান্য লক্ষণনির্ভর চিত্রকর্ম পাওয়া যায়, যার উভয়ের মাপজোখ প্রায় অভিন্ন। ফলে ভারতীয় শিল্প Craft আর ইউরোপীয় শিল্প Fine Art—এই দাবি আলোচ্য গ্রন্থে জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থের আরেকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের ফারাক নির্মাণের রাজনীতির চরিত্র চিহ্নায়ন, যা চিহ্নায়নে ব্যর্থ হয়েছেন আনন্দ কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এই সময়ের তাত্ত্বিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। উপনিবেশিতের একটি অবশ্যম্ভাবী চরিত্র হচ্ছে উপনিবেশকের অনুকরণ। যদিও কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথ উভয়েই এই অনুকরণবিরোধী এবং ভারতশিল্পের স্বতন্ত্রতাকামী, তবু তাঁরা উভয়েই ভারতশিল্পের স্বতন্ত্রতাকে চিহ্নিত করেছেন আধ্যাত্মিকতাকে উপজীব্য করে, যা আবার যুক্তিবাদিতার বিপরীত। ফলে যে ফারাক ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড নির্মাণ করতে ও রক্ষা করতে চেয়েছে, তা কুমারস্বামী ও অবনীন্দ্রনাথের দাবির মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়েছে। ফলে এ কথা বলা ভুল হবে না যে কুমারস্বামী ও অবনীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের ফারাক নির্মাণ কৌশলই বোঝেননি। অন্যদিকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে খুব চমৎকারভাবে উপনিবেশকের ফারাকের রাজনীতি তুলে ধরেছেন, যদিও তার ব্যর্থতা ঠিক এর পরবর্তী ধাপে। তিনি বলেন,

> The colonial states we must remember, was not just the agency that brought the modular forms of the modern to the colonies; it was also an agency that was destined never to fulfil the normalizing mission of the modern state because the premise of its power was a rule of colonial difference, namely, the preservation of the alienness of the ruling group. (Chatterjee 2012 : 221)

কিন্তু এই ফারাকের রাজনীতির বিপরীতে যে জাতীয়তাবাদী প্রকল্প ভারতীয়রা হাতে নিয়েছিল, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সেখানে তারা জাতিসত্তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক—এ দুই পরিষ্কার বিভাজিত প্রকোষ্ঠ তৈরি করেছিল এবং অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়কে ঔপনিবেশিক প্রভাবের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে এই অভ্যন্তরীণ অংশকে কেন্দ্র করেই দানা বেঁধেছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতি। কিন্তু এই রাজনীতির দুটি গভীর ফল হলো আত্মসত্তার দ্বিবিচ্ছেদায়ন এবং উপনিবেশকের কাঙ্ক্ষিত ফারাক নির্মাণকে আরও গভীর করা। এই দ্বিবিচ্ছেদায়ন বলতে নিজার বুঝিয়েছেন, আত্মসত্তা থেকে উপনিবেশের প্রভাবে প্রথমবার বিচ্ছেদের পর সেই আত্মসত্তায় ফেরার আকাঙ্ক্ষা থেকে যখন পুনরায় আত্মসত্তার নির্মাণ ঘটে, যা উপনিবেশ-পূর্ব আত্মসত্তা থেকে ভিন্ন, তখন আত্মসত্তার দ্বিবিচ্ছেদায়ন ঘটে।

এই দ্বিবিচ্ছেদায়নপ্রক্রিয়া সম্পর্কে নিজার বলেন, 'প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাক্-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির একটি বিশেষ অংশের ওপর ভিত্তি করে আত্মপরিচয় নির্মাণ করে। এই নির্মিত পরিচয় যখন 'আধ্যাত্মিকতা', তখন তা পুনরায় আত্মসত্তার বিচ্ছেদ ঘটায়, অর্থাৎ দ্বিবিচ্ছেদায়ন হয় (নিজার ২০১৭ : ৯৮)।

লেখক 'ভারতশিল্প আধ্যাত্মিক না বাস্তববাদী' অনুচ্ছেদে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কেন এই অঞ্চলের চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিকতা হতে পারে না। তিনি বলেন :

> এ অঞ্চলের চিন্তার সামান্যচিত্রকে আধ্যাত্মিকতা ভাবা ভুল হবে, কারণ এখানে যুক্তিচর্চার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, রয়েছে বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞানচর্চার ইতিহাস। বৈদিক সাহিত্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদ এবং অভিধম্মপিটকে দার্শনিক আলোচনায় যুক্তির পরিষ্কার ব্যবহার দেখা গেলেও যুক্তিবিদ্যা নিয়ে আদি গ্রন্থসমূহ হলো : *কথাভত্থু*, *চরক সংহিতা* এবং *ন্যায়সূত্র*। এই গ্রন্থসমূহ ধারাবাহিকভাবে আলোচিত, সমালোচিত ও বিশ্লেষিত হয় দিঙনাগ, ধর্মকীর্তি, অসঙ্গ, বাচস্পতি, গঙ্গেষ, কুমারিল, রঘুনাথ শিরোমণি এবং সপ্তদশ শতাব্দীর যুক্তিবিদ অন্নম ভট্ট ছাড়াও আরও অনেকের লেখায়, যা পরবর্তীকালে জন্ম দেয় প্রাচীন-ন্যায়, বৌদ্ধ-ন্যায়, জৈন-ন্যায় ও নব্য-ন্যায় নামক চারটি সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র ধারার। তবে সেই যুক্তি অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা থেকে ভিন্ন। কিন্তু অরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণান, সুরেন্দ্রনাথসহ সে-সময়কার গবেষকদের লেখায় এখানকার বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তা উপেক্ষিত হয়েছে। উপরন্তু, চরিত্র বিবেচনায়

> ভারতশিল্পে আধ্যাত্মিক নয়, আধ্যাত্মিকতা তার অপরাপর বিষয়গুলোর একটি। (নিজার ২০১৭ : ২৫)

এখন এই আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করে যখন উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বিবর্তিত হয়, তখন আত্মসত্তার দ্বিবিচ্ছেদায়ন তো ঘটেই, উপরন্তু উপনিবেশের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতিকেই আরও গভীর করে তোলে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়টি তাঁর প্রবন্ধে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা উপেক্ষা করেছেন।

সৈয়দ নিজারের দাবি, কেবল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ই নয়, সমসাময়িক অনেক তাত্ত্বিককেই নাড়া দেয়, যাঁরা মনে করেন যে এই অঞ্চলের প্রাক্-ঔপনিবেশিক তথা ঐতিহ্যিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় সন্ধান করা উচিত আধ্যাত্মিকতার সূত্র ধরে।

এই আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করে যদি দ্বিবিচ্ছেদায়ন হয়ে থাকে, তবে বি-উপনিবেশায়ন কীভাবে সম্ভব? নিজার আলোচ্য গ্রন্থে বি-উপনিবেশায়ন সম্পর্কে বলেন :

> ....বিউপনিবেশায়ন মানে দরজা-জানালা বন্ধ করে প্রাক্-ঔপনিবেশিক মননে ফিরে যাওয়া নয়। বাস্তবে তা সম্ভবও নয়। কিন্তু প্রাক্-ঔপনিবেশিক চিন্তার সাথে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বিউপনিবেশায়ন সম্ভব নয়। সে কারণে বিউপনিবেশায়নকে প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভাবনাগুলোর সৃষ্টিশীল বৈশ্বিক রূপান্তর বলা যেতে পারে (নিজার ২০১৭ : ২৩)।

ঠিক এই সূত্র ধরেই লেখক সুলতানকে উপস্থাপন করেছেন বি-উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার উদাহরণ হিসেবে। ফলে এই গ্রন্থে সুলতান বি-উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার উপলক্ষ, কিন্তু গ্রন্থের কেন্দ্রীয় ভাবনা নয়। আবার সুলতানের উদাহরণ ছাড়া গ্রন্থের পুরো প্রকল্প পূর্ণতাও পায় না।

লেখকের বি-উপনিবেশয়ান ভাবনার সূত্র ধরে যদি সুলতানকে বি-উপনিবেশিত বলতে হয় বা তাঁর ভাবনাকে বি-উপনিবেশিত ধরতে হয়, তবে শর্ত থাকে যে ভারতশিল্পের অভিমুখিতা সুলতানের চিত্রকর্মে থাকতে হবে এবং উপনিবেশের প্রভাব মাড়িয়ে সেই অভিমুখিতা রক্ষা করে বৈশ্বিক রূপান্তর ঘটতে হবে। লেখক সুলতানের বি-উপবেশায়ন ভাবনা বা সচেতনতা দেখিয়েছেন তাঁর কাজের বিষয়বস্তু ও অঙ্কনকৌশল আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে। সুলতান মূলত গ্রামীণ মানুষ ও তার সংস্কৃতিকে তার ছবির বিষয় হিসেবে নিয়েছেন। এই বিষয়বস্তু নির্বাচনে যে দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে তা হচ্ছে, উৎপাদননির্ভর গ্রামীণ জীবন উপনিবেশকের নির্যাতন সহ্য করেছে এবং পণ্য সরবরাহ করেছে, কিন্তু কখনো উপনিবেশিত হয়নি, যা হয়েছিল কলকাতা বা ঢাকার মতো শহুরে মানুষেরা। ফলে সুলতান স্বাভাবিকভাবেই অ-উপনিবেশিত গ্রামীণ কর্মময় জীবন ও তার টিকে থাকার শক্তিকে বি-উপনিবেশায়নের প্রেরণা হিসেবে নিয়েছেন। এখানে উল্লেখ থাকা ভালো যে কেবল গ্রামীণ জীবনের ছবি আঁকলেই তা বি-উপনিবেশিত

চেতনার প্রকাশ হয় না। কেননা, প্রায়ই উপনিবেশের কেন্দ্র ও প্রান্ত বিভাজনে প্রান্তিক জীবন 'বিচ্ছিন্ন অপর' রূপে কেন্দ্রের মায়া লাভ করেছে। আর এই মায়ার উপস্থিতি কেন্দ্র ও প্রান্তের বিচ্ছেদকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু সুলতানের আঁকা গ্রামীণ জীবন প্রান্ত বা অপর নয়, তা আত্মসত্তার পুনর্নির্মাণের ভিত্তি ও কেন্দ্র। সুলতানের কৃষকের পেশিশক্তির আধার, সেখানে আধ্যাত্মিকতার ঠাঁই নেই। ফলে অবনীন্দ্রনাথ যেখানে ভারতমাতার আধ্যাত্মিকতায় প্রতিরক্ষা খুঁজেছেন, সুলতান সেখানে কৃষকের পেশিতে খুঁজেছেন বি-উপনিবেশায়ন সূত্র।

অন্যদিকে সুলতানের চিত্রকর্মে ভারতশিল্পের অভিমুখিতা পরিলক্ষিত হয় অঙ্কনকৌশলের দিক থেকেও। তিনিও এঁকেছেন ভাবনির্ভর চিত্র। ফলে তাঁর নারী-পুরুষ বিশাল এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্রেও যা পরিলক্ষিত হয়। আবার সুলতানের ফিগারগুলো মাইকেলেঞ্জেলোর থেকেও আলাদা। কেননা, মাইকেলেঞ্জেলোর চিত্রের দৃষ্টিবিন্দু আছে, কিন্তু সুলতানের চিত্রে নেই। পাশাপাশি 'মাইকেলেঞ্জেলোর ফিগারগুলো কিউবিক পদ্ধতিতে আঁকা, সুলতানের রেখার টান বৃত্তীয়' (নিজার ২০১৭ : ১১১)।

এভাবে লেখক দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে সুলতান বিষয়বস্তু ও অঙ্কনরীতি দুই দিক থেকেই উপনিবেশের প্রভাবগুলো মাড়িয়ে বি-উপনিবেশায়নের চেষ্টা করেছেন। তাঁর চিত্রকর্ম ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের কেন্দ্র-প্রান্ত, যুক্তি-অধ্যাত্ম ইত্যাদি ফারাক নির্মাণের বিরুদ্ধ প্রয়াস। আর তাই সুলতান ভারতশিল্পের বি-উপনিবেশায়নের একটা ভাবনাসূত্র, ইঙ্গিত বা উদাহরণ, কিন্তু একমাত্র রূপরেখা নয়। সুলতানের ভাবনা ও কর্ম বি-উপনিবেশায়নের একক রূপরেখা হলে তা জাতীয় শিল্পের ধারণার মতো বিপদ ডেকে আনবে। আর তা উপনিবেশের মতোই ক্ষতিকর বলে লেখক সতর্ক করেছেন।

বাংলা ভাষায় তত্ত্বচর্চার ভাষা-নির্মাণ প্রয়াস গ্রন্থটির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। পুরো গ্রন্থে কোথাও লেখক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের ওপর নির্ভর করে তাঁর চিন্তার তত্ত্বায়ন করেননি। ব্যবহার করেছেন 'অভিমুখিতা', 'দ্বিবিচ্ছেদায়ন', 'দ্বৈত চিৎ'-এর মতো শব্দ, যা বাংলা ভাষায় তত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষ সংযোজন ও নজির হয়ে থাকবে।

গ্রন্থটির প্রধানতম দুর্বলতা হচ্ছে 'পাসিং কমেন্ট'। লেখক কোথাও কোথাও খুব বেশি তাড়াহুড়া করেছেন। যেমন লেখক ৬৭ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'হাইনরিখ জিমার ম্যাক্স মুলারের পর সবচেয়ে বিখ্যাত ও আলোচিত জার্মান ভারততত্ত্ববিদ এবং ভারতশিল্পতাত্ত্বিক'। কিন্তু এই লাইনের পর আর জিমারের প্রসঙ্গ নেই। ৭৮ পৃষ্ঠায় একইভাবে ভিকেলমানের শিল্পকলার বিবর্তনতত্ত্বের কথা এসেছে, কিন্তু তত্ত্বটি কী ছিল, তা আর জানা যায় না।

গ্রন্থটির উপসংহার খুব বেশি চেপে ছোট করে নেওয়া। ফলে উপসংহার গ্রন্থটির দাবি পূরণ করে না। পাশাপাশি পুরো গ্রন্থে সুলতানের ভাবনা বলে যে কথাগুলো উঠে এসেছে, তার সম্পূর্ণ বা যথেষ্ট তথ্যসূত্র নেই। অন্যদিকে, জাতীয় শিল্পের ধারণা কেন বিপজ্জনক, তা-ও বিস্তারিত আলোচিত হয়নি। অভিমুখিতার সীমা কতখানি, অভিমুখিতা রক্ষা শিল্পীর স্বাধীনতা খর্ব করে কি না বা অভিমুখিতা রক্ষার সঙ্গে জাতীয় শিল্পের পার্থক্য কী, তা আরও স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

তবে এসব অসতর্কতা বা তাড়াহুড়াজনিত ত্রুটি লেখকের প্রস্তাব ও মৌলিক বক্তব্যকে ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল করে না। সর্বোপরি গ্রন্থটির সবচেয়ে অসাধারণ দিক হচ্ছে, উপনিবেশকের ফারাক নির্মাণের রাজনীতি চিহ্নিতকরণ এবং সেই ফারাক ঘোচানো প্রতিবয়ান দাঁড় করানো। এ অঞ্চলের শিল্পকলার ইতিহাস নির্মাণেও গ্রন্থটি দারুণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি পুলিশ, প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয় ও চিন্তার বি-উপনিবেশায়নের প্রক্রিয়াও কেমন হতে পারে বা কোন সচেতনতাকে কেন্দ্র করে হতে পারে, গ্রন্থটি তারও ইঙ্গিত রাখে। এমনকি সুলতান ও তার কাজগুলোকে নতুনভাবে পুনঃ উপস্থাপন করেছে এই গ্রন্থ এবং আমাদের বি-উপনিবেশিত আত্মসত্তার বিনির্মাণে এই অঞ্চলের যুক্তিচর্চার ইতিহাস যে খতিয়ে দেখা উচিত, তা এই গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ২০১৭ সালে। প্রকাশ করেছে চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, বাংলাদেশ।

তথ্যসূত্র

১. Bourdieu, P. (1996). *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste* (R. Nice, Trans.), Cambridge, MA : Harvard University Press

২. Chatterjee, P. (2012). Whose Imagined Community?, In G. Balakrishnan (Ed.), *Mapping the Nation* (pp 214-225). New York, NY : Verso

৩. নিজার, সৈয়দ (২০১৭), *ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন ও সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা*। সিলেট : চৈতন্য প্রকাশন

লে খ ক প রি চি তি

মির্জা হাসান

সামাজিক বিজ্ঞানী হিসেবে বর্তমানে কর্মরত আছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে (বিআইজিডি)। পড়াশোনা করেছেন ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে। তাঁর গবেষণার বিষয় মূলত রাজনৈতিক উন্নয়ন, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন, রাষ্ট্র-ব্যবসা সম্পর্ক, জাতীয় ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা এবং মানবাধিকার। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাজ্যের *জার্নাল অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ* থেকে বাংলাদেশের কর সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ে নিবন্ধ এবং 'পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশন ইন বাংলাদেশ,' শিরোনামে *কনফ্লিক্ট, সিকিউরিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট*, ইউকে থেকে প্রকাশিত নিবন্ধ। প্রকাশিত বই অধ্যায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত *ডিলস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট* বইয়ে 'পলিটিক্যাল ইকোনমি অব স্টেট-বিজনেস রিলেশনস ইন বাংলাদেশ' নামক অধ্যায় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত *পলিটিক্যাল ইকোনমি অব এডুকেশন ইন বাংলাদেশ* বইয়ে 'পলিটিক্যাল ইকোনমি অব প্রাইমারি এডুকেশন ইন বাংলাদেশ' নামক আরও একটি বইয়ের অধ্যায়। বর্তমানে তিনি বিআইজিডির হয়ে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় সামাজিক জবাবদিহি বিষয়ে অ্যাকশন রিসার্চের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যা বিশ্বব্যাংকের তরফ থেকে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে।

এম এম আকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর মূল আগ্রহের বিষয় গ্রামীণ আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং একবিংশ শতকের সমাজতন্ত্র। উল্লেখযোগ্য বই: *ভাষা আন্দোলনের শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ*, *বাংলাদেশের অর্থনীতি: অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ* এবং *Poverty Reduction Strategies of the International Development Community: The scope for structural change*. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির প্রথম

পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চের চেয়ারম্যান, বিআইডিএসের সিনিয়র ফেলো, বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য। আজীবন সদস্য, বাংলা একাডেমি ও অর্থনীতি সমিতি।

হাসান ফেরদৌস

লেখক ও সাংবাদিক। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে *প্রথম আলোর* বিশেষ প্রতিনিধি। দীর্ঘদিন কাজ করেছেন জাতিসংঘের সদর দপ্তরে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন ইউক্রেনের কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বিশের অধিক। এ বছর একুশের গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত দুটি বই : *যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ* (ইত্যাদি) এবং *ছয় জাদুকর* (বেঙ্গল)।

বাশার খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। গবেষক হিসেবে কাজ করছেন বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির *এনসাইক্লোপিডিয়া অব বাংলাদেশ ওয়ার অব লিবারেশন* প্রকল্পে। একটি বেসরকারি টেলিভিশনের নিউজরুম এডিটর ছিলেন। বর্তমানে একটি গ্রুপ অব কোম্পানির জনসংযোগ বিভাগের প্রধান। জাতীয় দৈনিক ও বিভিন্ন জার্নালে একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে "একুশের কারা নির্যাতিত নারী", "পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলন" ও "একাত্তরের ঈদ" অন্যতম। প্রকাশিত গ্রন্থ : *একাত্তরের ঈদ* (দ্যু প্রকাশন) এবং *মুক্তিযুদ্ধে দাউদকান্দি* (যৌথ— দ্যু প্রকাশন)।

আসজাদুল কিবরিয়া

লেখক ও সাংবাদিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। অর্থনীতি বিষয়ে লেখালেখি বেশি করেন। ইতিহাসে আগ্রহী। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *অর্থনীতির অনর্থ* (জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৪); *ট্রানজিটের টানাপোড়েন* (জাগৃতি, ২০১২)। *ভাষা আন্দোলনের গল্প* (প্রজাপতি, ১৯৯৪) গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার।

সামজীর আহমেদ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পরবর্তী সময়ে সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন (কালচারাল স্টাডিজ) বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন দ্য ইংলিশ অ্যান্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউনিভার্সিটি, হায়দরাবাদ থেকে। বর্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। প্রকাশিত লেখার মধ্যে রয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতার স্থানিক প্রয়োগযোগ্যতা : একটি অধিতাত্ত্বিক পাঠ', *মানববিদ্যা গবেষণাপত্র* (জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়), বর্ষ ০২, সংখ্যা ০২, জুলাই ২০১৮; এবং 'সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের জ্ঞানতাত্ত্বিক আচরণ', *চিন্তাযান*, সংখ্যা ০২, জানুয়ারি ২০১৯।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ নগদ টাকাও পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুইশত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চারশত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

প্রথমার বই সারা বছর সেরা বই

প্রবন্ধ, গবেষণা ও অন্যান্য

আহমদ রফিক
- **ভাষা আন্দোলন : টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া** ৳ ৩৫০

আকবর আলি খান
- **বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণা** ৳ ২৬০
- **দুর্ভাবনা ও ভাবনা : রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে** ৳ ৬০০

গোলাম মুরশিদ
- **বাংলা ভাষার উদ্ভব ও অন্যান্য** ৳ ৪৫০

আজিজুর রহমান খান
- **আমার সমাজতন্ত্র : সমাজতন্ত্রের উত্থান, পতন ও ভবিষ্যৎ** ৳ ৩২০

মহিউদ্দিন আহমদ
- **এক-এগারো : বাংলাদেশের রাজনীতি ২০০৭-২০০৮** ৳ ৯০০

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
- **পলাশীর এক ইংরেজ সৈনিকের কালপঞ্জি** ৳ ২৩০

আলতাফ পারভেজ
- **যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ** (২য় মুদ্রণ) ৳ ৩০০

রায়হান রাইন
- **বাংলার দর্শন : প্রাক্-উপনিবেশ পর্ব** ৳ ৫৫০

মোহাম্মদ আজম
- **বাংলা ও প্রমিত বাংলা সমাচার** ৳ ৪২০

মামুন আল মোস্তফা
- **লালনের রাজনীতি** ৳ ৩২০

মুহিত হাসান
- **দিশি ও বিলাতি** ৳ ২২০

আত্মস্মৃতি, স্মৃতি, স্মৃতিকথা

সিমিন হোসেন রিমি
- **আমার ছোটবেলা, ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ** ৳ ৪৫০

সংকলন ও রুশ থেকে অনুবাদ : জাহিদ রেজা নূর
- **তিন প্রেমিকার মায়াকোভ্স্কি** ৳ ৫০০

আবুল মনসুর আহমদ
- **আত্মকথা** ৳ ৭৫০

কামরুদ্দীন আহমদ
- **বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী** ৳ ৭৫০

প্রথমা

প্রথমা • ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ৮১৮০০৭৮-৮১
• ৪৩-৪৪ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ৯৬৬৪৮২৫

অনলাইনে বই কিনুন : www.prothoma.com

বিজ্ঞানচিন্তা
প্রকাশিত হচ্ছে
প্রতি মাসের ১৫ তারিখ
হকারকে বলে রাখুন
bigganchinta
BigganChinta